দাঈশের ইতিহাস এবং পর্যালোচনা

Bearded Bengali

দাঈশের অভিযোগগুলোর অনেক অনেক খন্ডন গত ১০ বছর ধরে হয়ে আসছে। তবুও দাঈশের লোকজন তরুণ যারা সিরিয়ার জি-হাদের বিষয়ে তেমন একটা জানে না, তাদের কাছে নিজেদের মন মত করে একটা ইতিহাস বর্ণনা করে অপর মুসলিমদের প্রতি মন বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করে। বারবার তাদের জবাব দেয়ার চেয়ে আমি বরং তাদের ইতিহাসটা বলার চেষ্টা করবো সময়ে সময়ে, এতে ইতিহাস থেকে শিক্ষা এবং তাদের কিছু অভিযোগের জবাব পাবেন। তবে সকল অভিযোগের জবাব যেন আপনারা নিজেরাই বের করতে পারেন, এর জন্য ইতিহাস থেকে শিক্ষাটা জরুরী।

দাঈশকে চিনতে হলে আপনাকে সিরিয়া না, আগে ইরাকে যেতে হবে। আমিও ইরাকের দাঈশকে এই আপাতত পোস্টে ফোকাস করবো।

ইরাক আক্রমণের পরে আমরিকা ইরাকী সেনাবাহিনী ভেঙে দিয়ে নতুন সেনাবাহিনী এবং প্রশাসন তৈরী করার চেষ্টা করে। এবং সেখানে শিয়ারা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে, সুন্নীরা খুব একটা সুযোগ পায় না। এ কারণে সুন্নী মু-জাহিদ গ্রুপগুলো ব্যাপক জনসমর্থন পেতে শুরু করে। এমনকি সাদ্দামের সেনাবাহিনীর চাকরিচ্যুত সেনারাও এসব বাহিনীতে যোগদান, তাদের প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব, অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করতে থাকে।

অনেকগুলো মু-জাহিদ দল থাকলেও, আবু মু'সআব আয-যারকাওয়ী (রহ) এর জামাতুত তাওহীদ ওয়াল জি-হাদ তথা একিউ ইন ইরাক ছিল সবচাইতে প্রমিনেন্ট এবং দূর্ধর্ষ। সিরিয়া, জর্ডান এবং আরবের অন্যান্য জায়গা থেকে মু-জাহিদরা এই দলের সাথেই যোগদান করা শুরু করে। মূলত এই একিউআই - ই ছিল তখনকার নেতৃত্ব দান কারী দল। সাথে আরেকটা ঐতিহ্যবাহী দলের নাম না বললেই না, যা এখনো অস্তিত্বে আছে, সেটা হল কুর্দীদের আন-সার আল-ইসলাম।

আয-যারকাওয়ী মার্কিনদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছিলেন। তিনি ছিলেন মার্কিনীদের মূল মাথা ব্যাথার কারণ। কিন্তু সুন্নীরা শিয়াদের উপর চরম ক্ষিপ্ত ছিল, তাদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং সুযোগের অপব্যবহারের কারণে। আফগান থেকে একিউ মূল নেতৃত্বের নির্দেশ ছিল যে, শিয়াদের সাথে যেন যুদ্ধে না জড়িয়ে যায়, এরপরও একিউআই শিয়াদের সাথে পার্শ্বীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম বড় উসূল হল, পার্শ্বীয় যুদ্ধে জড়ানো যাবে না। আপনার সামনে আরেকটু গেলে বুঝবেন যে, কেন ইরাকের গেরিলা যুদ্ধ ব্যর্থ হল, কিন্তু আফগানেরটা সফল হল। এর একটা কারণ আফগানের গেরিলারা পার্শ্বীয় যুদ্ধে জড়ায় নি, কিন্তু ইরাকের গেরিলারা জড়িয়েছিল।

এরকম যখন চলছিল, ২০০৬ সালে আমীর আবু মুসা'ব (রহ) মার্কিন এয়ার স্ট্রাইকে শহীদ হন। তখন একিউআই এর ডেপুটি ছিলেন আবু হামজা আল-মুহাজির। ওনার মৃত্যুর কিছু পরে, আফগানের একিউ শুনতে পায় যে, ইরাকে একটা স্টেট ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ একিউ সহ অন্যান্য কিছু মু-জাহিদ গ্রুপ মিলে একটা শূরা গঠন করে, এরপর ওই শূরা আবু উমার আল-বাগদাদী যিনি অন্য একটা গ্রুপের আমীর ছিলেন, গঠিত শূরা ওনাকে সদ্য গঠিত ইসলামিক স্টেট অব ইরাকের আমীর ঘোষণা করে।

আফগানে একিউ এ ঘোষণায় অবাক হয়। যখন তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তখন আবু হামাজা জানান যে, এটাই পরিস্থিতির দাবী ছিল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে। বরং এই নতুন স্টেট-টি একিউর গ্লোবাল জি-হাদের অংশ হয়েই কাজ করবে, তারাও একিউর তুনের একটি তীর - এই বলে আশ্বস্ত করা হয়।

এই যে নতুন স্টেট তৈরী হল - এ জিনিসটাকেই আই-এসের সমর্থকরা প্রমাণ হিসেবে হাজির করে যে, এখান থেকেই তারা একটা স্বাধীন ইমারাহর অধিকারী হয়েছে। তারা আর একিউর নির্দেশ মানতে বাধ্য নয়। তারা আর আফগানের ইমারা'র অধীনস্ত কোন বাহিনী নয়। বরং তারা হল রাষ্ট্র, আর রাষ্ট্র কি করে সংগঠনের আনুগত্য

করবে? বরং সংগঠনকে রাষ্ট্রের আনুগত্য করতে হবে। তাই একিউ'র উচিত আই-এসের আনুগত্য করা, ঠিক যেমন ইরাকের একিউ এই ইরাকের ইসলামিক স্টে-টের অনুগত হয়েছিল, মূল একিউ নেতৃত্বের অনুমতি ছাড়াই। কিন্তু ইরাকের একিউর এই কাজটা ভুল ছিল। এবং একই ভুল সিরিয়ার একিউ-ও পরবর্তীতে করে। যাই হোক। গেরিলা যুদ্ধের নিয়মানুসারে একিউ কিংবা ইরাকে সকল মু-জাহিদরা কোনভাবেই স্টেট ঘোষণার পর্যায়ে ছিল না। স্টেটটা ছিল জাস্ট একটা নাম। তারা তখনো একটা গেরিলা দল, বেশীর থেকে বেশী হলে কিছুটা মিলিশিয়া টাইপের চেয়ে বেশী কিছু ছিল না।

গেরিলা যুদ্ধে রাষ্ট্র তৈরী হয় বিজয়ের পর, কিংবা তৃতীয় মারহালায়। অথচ ইরাকের যুদ্ধ তখন প্রথম মারহালাই পার করে নি ঠিকমত। প্রথম মারহালায় রেইড-এ্যামবুশ চলবে শুধু। দ্বিতীয় মারহালায় গিয়ে গেরিলারা কিছু কিছু জায়গায় প্রকাশ্য হওয়া শুরু করবে। কিছুটা জনগণের ব্যবস্থাপনার চেষ্টা করবে, কিন্তু অফিশিয়ালি জনগণের নেতৃত্ব নিবে না। এবং যে কোন সময় জায়গা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত থাকবে। জায়গা দখলে রাখার জন্য দ্বিতীয় মারহালায় তারা কখনোই সম্মুখ সমরের পথ বেছে নিবে না। বরং রিট্রিটি করবে।

কিন্তু ইরাকের স্টেট এই সবগুলো ভুল করে। যেহেতু স্টেট ঘোষণা করেছে, তাই অফিশিয়ালি জনগণের দায়িত্ব তাদের কাঁধে। এবং জায়গা ধরে রাখারও একটা বিষয় চলে আসে। এবং তারা কিছু জায়গায় প্রকাশ্য হয়, এবং জায়গা ধরে রাখতে মার্কিনদের সাথে ব্যাপক যুদ্ধও করে। কিন্তু প্রকাশ্যে চলে আসায় এয়ার স্ট্রাইকের বিপরীতে তাদের কোন ডিফেন্স ছিল না। এবং সুন্নী জনগণের একটা অংশ বিশেষ করে গোত্রীয় লীডাররা তাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। এটা কিছু আছে মার্কিনীদের প্ররোচনায়, কিছু স্টেটের নিজস্ব মিস-ম্যানেজমেন্টের কারণে। এটাও গেরিলা যুদ্ধের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, তারা জনগণের সমর্থন ধরে রাখবে। কোনভাবেই জনগণের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া যাবে না। দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও দায়িত্ব জোর করে নিলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

শুরুতে শিয়া, এর পরবর্তীতে সুন্নীদের একাংশের সাথেও বিরোধে জড়িয়ে ইরাকের স্টেট মূলশত্রু মার্কিনদের জন্য গেইমটা সহজ করে দিয়েছিল, তাও আবার নিজেরা প্রকাশ্য চলে এসে। এর প্রতিটা কাজ ছিল গেরিলা যুদ্ধের জন্য কাউন্টার প্রোডক্টিভ। এবং তারাও আবারও তথাকথিত স্টেট থেকে গড়পড়তার একটা গেরিলা যোদ্ধা দলে পরিণত হল, যারা গেরিলা যুদ্ধের প্রথম মারহালায়-ই রয়ে গেলো।

এদিকে আফগানে কিন্তু খুব স্লো এ্যান্ড স্ট্যেডি খেলা হচ্ছিল। নিশ্চিত না হয়ে প্রথম মারহালা থেকে দ্বিতীয় মারহালার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছিল না। প্রকাশ্যে আসলেও আফগানে রিট্রিট করার বহু নযির আছে সম্মুখ যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ইরাকের মু-জাহিদরা ফাস্ট, ইনটেন্সড যুদ্ধ বেশী করেছিলো সত্য, কিন্তু তাদের ওভারঅল যুদ্ধের তাড়াহুড়ো থেকে আফগানের সলো খেলাটা বেশী ফলদায়াক হয়েছে, যা আজকে আমাদের সবার কাছে প্রমাণিত। ইরাকের স্টেট ঘোষণা করার পরও, কেন একিউ তাদের কিছু বললো না? একিউ কিছু বলে নি যে, তা না। যেহেতু এটা স্ট্র্যাটিজিগত বিষয় - তাই জাস্ট স্ট্র্যাটিজিগত ভুলের কারণে কারো সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা যায় না। এরকম কৌশলগতভুল পাকিস্তানেও কম হয় নি। কিন্তু একিউকে আশ্বাস্ত করায়, একিউও ইরাকের স্টেটকে মেনে নেয়। সবদলকে স্টেটের অধীনে আসতে বলে। কারণ আলাদা থাকার চেয়ে একসাথে থাকা ভালো। আর স্টেট তৈরী মূল উদ্দেশ্যই ছিল একটা দল তৈরী করার। কামে স্টেট না হলেও অন্তত ঐক্যের জন্য একটা স্টেট নামে থাকলে তো কোন ক্ষতি নেই।

এখানে বিতর্কের জায়গা হল যে, আই-সের লোকেরা শাইখ যাওয়াহিরীর একটা বক্তব্য শো করে যেখানে তিনি ইরাকের এই দাও-লাহকে ইরাকের সকলে বা'য়াহ দিতে বলেন, এবং আবু উমার আল-বাগদাদীকে আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে সম্বোধন করেন। এ থেকে তারা প্রমাণের চেষ্টা করে যে, আবু উমার স্বাধীন ইমারাতের আমীর। এই ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, একিউ হয়ত পরিস্থিতির জন্য তখন প্রকাশ্যে তাদের প্রেইস করেছিল, পরবর্তীতে এরা এমন করবে জানলে হয়তো এরকম ভাবে সম্বোধন করা হতো না। কিন্তু ইন্টার্নালি তাদের বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে বিভিন্ন চিঠির জবাবের তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক এবং দিক নির্দেশনা দেয়া হত।

এভাবে আবু উমার আল-বাগদাদী (রহ) -ও মার্কিন এয়ার স্ট্রাইকে শহীদ হন ২০১০ এ। এরপরই আবু বকর আল-বাগদাদীকে আমীর ঘোষণা করা হয়। একিউর আশা ছিল এবার অন্তত তাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে আমীর নিয়োগে, কিন্তু এবারও আগে আমীর নিয়োগ করে, তারপর তার ব্যাপারে একিউকে জানানো হয়। একিউর আর তখন কি করার! তারা শুধু তার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানতে চেয়েই - সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

ইরাকের যুদ্ধটা খেয়াল করলে দেখবেন যে, বারবার গেরিলা যুদ্ধের নিয়মগুলো তারা ভঙ্গ করছিল। কেমন যেনো নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধের একটা ইচ্ছা। এটা শুধু দাঈশ না, প্রত্যেক দল, এমনকি জি-হাদী না এমন দলের বিষয়গুলো এমন তারা নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধ করতে চায়। যুদ্ধের কথা বললে নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধের উসূল, ফিক্বহ সামনে নিয়ে আসে। নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধ ব্যাপক সাহস দেখানোর সুযোগ থাকে, অন্যদিকে গেরিলা যুদ্ধ হলো ধৈর্য আর টিকে থাকার লড়াই।

আর শরীয়াহ কায়েমের বিষয়টা কেমন? দাঈশের একটা ফেনমেনন এটা যে, শুধুমাত্র হুদুদ কায়েমকেই তারা শরীয়াহ কায়েম কিংবা এর অনুপস্থিতিকেই তারা শরীয়াহ বর্জন হিসেবে ধরে নেয়। এখন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে হুদুদ কায়েমের বিষয়টা কেমন? আমরা সাহাবাদের কাছ থেকে দেখি যে, তারা যুদ্ধকালীন সময় তো দূরের কথা, যুদ্ধের পরও কিছু সময় হুদুদকে হল্ট রাখতেন। আবার ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে ক্লিনশিট প্রমাণ না থাকলে তো হুদুদ কায়েম হবে না। একবার এক মহিলাকে প্রায় রজমের জন্য পাঠানোই হচ্ছিল। আলী (রা) এসে বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় কি তোমাকে ভয়-ভীতি দেখানো হয়েছিল। মহিলাটি ইতিবাচক উত্তর দেয়ায়, আলী (রা), উমর (রা) কে বলেন, ইয়া! আমীরুল মু'মিনীন তাকে রজম করানো যাবে না। তার সাথে জবরদস্তি করায় জিজ্ঞাসাবাদের সময়। অর্থাৎ কোন রকম সন্দেহ, জোরাজুরি করা যাবে না।

হুদুদ কায়েম করতে হবে সচ্ছতার সাথে। কোনরকম হুদুদ কায়েম করার নামই শরীয়াহ না। খলিফাদের জীবনী আর সাহাবীদের জীবনী ইন ডিটেইলস জানা না থাকলে শরীয়াহ কায়েম করা সম্ভব নয়। অথচ দাঈশ কোন রকমের একটা জায়গা পেলেই ওখানে শরীয়াহ কোর্ট বসিয়ে বিচার শুরু করে। তারা মনে করে, যেহেতু হুদুদ কায়েম অনেক সওয়াবের কাজ, সেহেতু যেভাবেই হোক তা কায়েম করতে হবে। অথচ বিষয়টা জোর করার না, কাউকে শাস্তি থেকে বাঁচানোর সুযোগ থাকলে তাকে ছাড় দিতে হবে। সাহাবাদের কাজ, খলিফাদের সুন্নত তো চর্চা দূরের কথা, জানা ই নেই আমাদের। এরা এক একজন আসে শরীয়াহ কায়েম শিখাইতে। হুদুদ কায়েম শিখাইতে। জানা ছাড়া অস্ত্র হাতে নিয়ে কেউ যদি শাসন করতে বসে যায়, সে তো সন্ত্রাসী আর ডাকাতে পরিণত হবে। দাঈশের কাছে তাওহীদ ছিল, কিন্তু ইসলামের ফিক্বহ ছিল না, দুনিয়ার ফিক্বহ-ও না।

গেরিলা যুদ্ধ রাজনৈতিক বিজয় অনেক বেশী গুরত্বপূর্ণ। আফগানে যে রাজনৈতিক বিজয়টা অর্জিত হয়েছিল আমরিকার সাথে চুক্তি করে। অথচ দাঈশ এরকম চুক্তিকে হারাম মনে করে। রাজনৈতিক ভাবে বিজয়ী হতে হবে, এই কনসেপ্টটাই তারা অস্বীকার করে। তাদের থিওরী হল, যাবো - জয় করবো - শাসন করবো। এরকম হলে তো ভালোই হত, বাট এটা এখন বাস্তব সম্মত না। বাস্তব সম্মত হলে তো আমাদের আর গর্তে থেকে গেরিলা যুদ্ধ করতে হতো না। বরং আমরা দূর্বল, সংখ্যায় কম দেখেই আমাদের বেশী কৌশলের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আমাদের এয়ার ডিফেন্স নাই। তো আমরা প্রকাশ্যে আসার নামঃ হলো ধুমধাম এরিয়াল বম্বিং এর শিকার হওয়া। এরকম অবস্থায় কি আমাদের জন্য হুদুদ কায়েম ওয়াজিব? কমনসেন্স বলেও একটা কথা আছে। বরং একটা রাজনৈতিক সমঝোতা বা দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে শত্রুর ক্লান্তির বদৌলতে আমরা কিছু সময় প্রকাশ্যে আসতে পারি, তাও যে কোন সময় রিট্রিটের মানসিকতা নিয়ে। এই প্রকাশ্য সময়টাতে আমরা অরাজকতার ব্যবস্থাপনা করবো। জনগণের হৃদয় জয় করার চেস্টা করবো। এতে রিক্রুটমেন্ট প্রসেস সহজ হবে, এই গেরিলারা ব্যর্থ হলেও জনগণের থেকেই নতুন গেরিলা মুভমেন্ট তৈরী হবে। আফগান-ফিলিস্তনের গেরিলারা তা পেরেছে, ইরাকের গেরিলারা তা পারে নি। গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে অ-জি-হাদীদের তো ব্যাপক ভুল ধারণা আছে, জি-হাদীদেরও সেই ভুল ধারণা কম না। "ডাক দিলেই ঝাপিয়ে পড়বো" - এটা সাহাবাদের জামানার সম্মুখ সমর না যে ডাক দিলেই ঝাপ দিতে পারবেন, তাও আবার তাদের মত প্রস্তুতি ছাড়াই। সবাই যুদ্ধের যে কল্পনা হাজির করে, তা হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক সম্মুখ সমরের। মুসলিমদের তথা জি-হাদীদের আসলেই এইটা করার সামর্থ্য নেই। এই জন্যই একদল লোক জি-হাদকেই পিছিয়ে দেয়, দিফাকেই অস্বীকার করে বসে। কারণ তারা গেরিলা যুদ্ধের সরূপ জানে না। একে কাপুরষতা বলে বসে। অথচ

কাপুরুষতা তো বলবে সরকারপক্ষ, যাদের বিরুদ্ধে গেরিলারা যুদ্ধ করছে। গেরিলাদের সাথে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের একটা অংশ এই যে, তাদের যুদ্ধ কে অবৈধ, কাপুরুষতা ঘোষণা করা আর নিজেদের কে সেই ভূমির একমাত্র বৈধ বাহিনী দাবী করা। এখন আলেমরা এখানে সরকারের মত গেরিলাদের অবৈধ বলার অর্থ হল, তারা সরকারের পক্ষ নিয়েছে। হয় তারা গেইমটাই বুঝে নাই যে, এসব কথাবার্তা রাজনৈতিক, কুওয়াত, বৈধ দাবীদার, কাপুরুষতার যুদ্ধ এসব রাজনৈতিক ম্যারপ্যাঁচে আটকে পড়বে। আপনি যার ন্যারেটিভের পক্ষে থাকবেন, সেই আসলে শক্তিশালী হতে থাকবে।

তাই গেরিলাদের এমন কিছু করতে হবে, যেন আলেমদের পক্ষে রাখতে পারে। এজন্য আগে নিজেদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখতে হবে। নতুবা আলেমরা সরকারের কোলে বসে পড়লে গেরিলাদের যুদ্ধ করতে কষ্ট হবে, অনেক ধৈর্য্য ধরতে হবে, স্লো হয়ে যেতে হবে মাত্রাতিরিক্ত। কারণ মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের প্রতিপক্ষের মাঝে আলেমরা দাড়িয়ে গেছে, তাদের সাথে আছে তাদেরও বিশাল সংখ্যক আওয়াম সমর্থক। এখন এদের সাথে সংশয় নিরসন তথা দাওয়াত এবং পরামর্শের সম্পর্ক না গড়ে, এদের সকলের সাথে সংঘর্ষের সম্পর্ক গড়লে গেরিলা যুদ্ধ আর সম্ভব হবে না। হ্যাঁ এদের মধ্যে সকলের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখাটা কঠিন হবে। কারণ কিছু লোক সরকার কিংবা বিদ্যমান ব্যবস্থার পক্ষেই থাকবে। এখন এদের সংখ্যাই যদি বেশী হয়, তাহলে সেটা গেরিলা যুদ্ধের জন্য অনুর্বর ভূমি। এখানে গেরিলারা টিকে থাকতে পারবে না।

গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রাকৃতিক কিছু বৈশিষ্ট্য লাগে। যেমন যথেষ্ট পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, অনেকগুলো দেশের সাথে বর্ডার, মোটামুটি বড় একটা দেশ, ইত্যাদি। এগুলোর কোনটার কমতি থাকলেও জনগণের সাপোর্ট মুসলিমদের ক্ষেত্রে এর সাথে যোগ হবে আলেমদের সাপোর্ট - এগুলো খুব প্রবলভাবে থাকতে হবে টিকে থাকার জন্য। আফগানে প্রাকৃতিক সাপোর্টের সাথে জনগণের, আলেমদের সাপোর্টও ছিল। ইরাকের বৈশিষ্ট্য কিন্তু আফগানের চেয়ে কম শক্তিশালী গেরিলাদের জন্য। কারণ আফগানের পাথুড়ে পাহাড়ের গুহাগুলো গেরিলাদের জন্য ন্যাচারাল এয়ার ডিফেন্স। অন্যদিকে ইরাকে এমনটা ছিল না। আর বেশীরভাগ ছিল আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার। এই পদ্ধতির এফিশিয়েন্সি, এবং বিজয়ের রেকর্ড সবচাইতে কম গেরিলা যুদ্ধের ভ্যারিয়েন্টগুলোর মধ্যে। যেমনটা ফিলিস্তিনেও। তাদের ন্যাচারাল ডিফেন্স নেই, কিন্তু তারা কৃত্রিম ডিফেন্স, মাটির নীচে সুড়ঙ্গ তৈরী করেছে। আর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দূর্বলতার বিপরীতে তাদেরকে হেভিলী জনগণের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার, শহর কেন্দ্রিক বা শহরের মাঝে যে গেরিলাযুদ্ধ চলে, জনগণ সবচাইতে ভরনারেবল পজিশনে থাকে। তাই তাদের সাথে সম্পর্ক এত ভালো থাকতে হবে যে, তারা নিজেরাই যেন কুরবানির জন্য রাজী হয়ে যায়। গাজ্জাতে জাস্ট জনগণের সাপোর্ট, তাদের কুরবানী যুদ্ধটাকে এখনো টিকিয়ে রেখেছে। অথচ দাঈশ এই সাপোর্টটা জনগণ থেকে পায় নি, দাঈশের দোষেই। জনগণকে আপনি অনেক বেশী পরহেজগার এরকম আশা করতে পারেন না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকরজম অনাচার থাকা সত্ত্বেও তাদের ঈমানী সাপোর্ট টা আপনাকে বের করে আনতে হবে। এটা আমাদের মাল্টিডাইমেনশনাল ওয়ারফেয়ারের একটা অংশ, একটা চ্যালেঞ্জ। ফিলিস্তিনে এটা সম্ভব হয়েছে। ইরাকেও কিছু হয়েছিলো। সিরিয়াতেও - কিন্তু আমাদের তাড়াহুড়ো - শরঈ রাজনীতি আর বাস্তবতার অপরিপক্ক বুঝ - নিজেদের পরহেজগারিতা, আর বুঝ নিয়ে অহংকার - অভিজ্ঞদের অভিজ্ঞতাকে সম্মান না করার প্রবণতা আমাদের ধ্বংস করল।

সিরিয়ায় কি হয়েছিল তা বুঝতে হলে আপনাদের সিরিয়া ইতিহাসটা জানতে হবে। আমি জাস্ট সংক্ষেপে বলছি। উসমানীদের পতনের পর ব্রিটেন আর ফ্রান্স সইকস-পিকোট চুক্তি করে নিজেদের মধ্যে আরব বিশ্ব ভাগ করে নেয়। সেই ভাগাভাগিতে সিরিয়া পড়েছিল ফ্রান্সের ভাগে।

এইরকম উপনিবেশিক শক্তিগুলো শাসন করার জন্য স্থানীয় কিছু বাহিনী এবং এলিট শ্রেণী তৈরী করে যাদের দিয়ে তারা শাসন করে, যেমন উপমহাদেশে জমিদারী সিস্টেম, ভারতীয়দের দিয়ে তৈরী করা সেনাবাহিনী, পরবর্তিতে ভারতীয়দের প্রশাসন দিয়েই কিন্তু ব্রিটিশরা শাসন করতো। কারণ এত জনবল ছিলো না। ঠিক তেমনি ফ্রান্সও সিরিয়াতে এই কাজটা করেছিল। তারা এক্ষেত্রে একদল জনবিচ্ছিন্ন ডাকাত দলের সাহায্য নেয়।

এই ডাকাত দলটা সভ্য সমাজের সাথে কখনোই তেমন একটা ছিল না। এরা আক্বীদায় আলাভী শিয়া, আলী (রা) - কে আল্লাহ ভাবে এরকম কিছএ আক্বীদাহ - নাউযুবিল্লাহ। তাদেরকে নুসাইরী শিয়াও বলা হয়। তো এদের দিয়েই ফ্রান্স সিরিয়া শাসন করে, এদের দিয়েই সেনাবাহিনী, প্রশাসন বানায়। আর স্বাধীনতা দেয়ার সময়ও এদের হাতেই ক্ষমতা ছেড়ে যায়।

এদেরই একজন হচ্ছে, বাশার আল-আসাদের বাবা, হাফিজ আল-আসাদ। সেই ৭০-৮০ দশক থেকেই ইসলামিস্টরা এদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করার চেষ্টা করে আসছে। আর এরা যে পরিমাণ নির্যাতন তৎকালীন মুসলিম ব্রাদারহুড কিংবা ইসলামিস্টদের করেছে, লীগ সেই তুলনায় তেমন কিছুই করে নি। এর একটা ভাইব পেতে আপনারা "জাস্ট ফাইভ মিনিটস" বইটা পড়তে পারেন।

৮০ 'র দশকে এই হাফিজ আল-আসাদ মুসলিমদের উপর হামাতে এক গণহত্যা চালায়। তৎকালীন মু-জাহিদদের সাথে যুদ্ধে যখন হাফিজ আল-আসাদ কোনঠাসা, সে, মু-জাহিদদের সাথে ডিল করে যে, তাদের জন্য একটা জায়গা ছেড়ে দিবে। মু-জাহিদরা স্বানন্দ্যে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে, যখনই নিজেদের প্রকাশ করা শুরু করলো, ওই শহরে গিয়ে জড়ো হল - আসাদ বিশ্বাস ঘাতকতা করে তাদের গণহত্যা করলো। ইসলামী বিপ্লব পঙ্গু হয়ে গেলো। গেরিলা যুদ্ধে প্রতিপক্ষের সাথে ডিলে যাওয়ার মারহালাও হচ্ছে তৃতীয় মারহালা - এসময়টাতে দরকষাকষি চলতে পারে, এর আগেই নিজেদের প্রকাশ করে ফেললে, যখন শত্রু যথেষ্ট ক্লান্ত কিংবা দূর্বল নয়, তখন এই রকম ঘটনা ঘটতে পারে। সেই বিপ্লব তো গেলোই। সেই বিপ্লবেরই এক সন্তান হলেন আবু মুসা'ব আস-সুরী, যাকে গ্লোবাল জি-হাদের আর্কিটেক্ট বলা হয়। যদি তিনি বেঁচে থাকেন, আল্লাহ তার জন্য সহজ করুক। অনেকের মতে তিনি সিরিয়ার কোন কারাগারেই আছে। তাকে পাকিস্তানী গোয়েন্দার আমরিকার হাতে তুলে দিয়েছিল ২০০৪ এর দিকে।
৮০ 'র দশকের বিপ্লবে ইখওয়ানের সমর্থন ছিল। কিন্তু তাদের নেতৃত্বগত ব্যর্থতাও ছিল বিপ্লবের ব্যর্থতার অন্যতম বড় কারণ। ইখওয়ানের রাজনৈতিক নেতারা বারবার জি-হাদী আন্দোলনগুলোকে ব্যর্থ করছিল। জনগণ ইখওয়ানের মাধ্যমেই মু-জাহিদদের সাহায্য করতো। কিন্তু ইখওয়ানের নেতারা ময়দানের স্বার্থের বিপরীতে তাদের স্থানীয় রাজনৈতিক সুবিধাকে বেশী প্রাধান্য দিতো, মু-জাহিদদের বাধ্য করতো সেই অনুযায়ী কাজ করতে। না মানলে তারা সাহায্য অফ করে দিয়ে তাদের বিপদে ফেলতো। এই কথাগুলো এখনো প্রাসঙ্গিক - এবং এখনো ঘটছে - তাই উল্লেখ করলাম। সমানের পর্বগুলোতে গেলে রিলেট করতে পারবেন।

৮০ 'র দশকের ব্যর্থতার পর, ২০১১ তে আবার বিপ্লবের দামামা বেজে উঠলো যখন সিরিয়ান বিমান/সেনা বাহিনীর সুন্নী অফিসাররা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এতদিনে হাফিজ আল-আসাদের পর তার ছেলে বাশার ক্ষমতায়। টিনেজারদের গুম করাকে কেন্দ্র করে, প্রটেস্টে গুলি করার বিপরীতে এই বিদ্রোহের জন্ম হয়।
সুন্নী এই আর্মিরা ফ্রি সিরিয়া আর্মী গঠন করে, তাদের অধীনে কিছু এলাকা নিয়ে নেয়, বিশেষ করে পূর্ব অঞ্চল। আরো অনেক জায়গায় স্থানীয়রাও বিদ্রোহে যোগদান করে, সরাকারি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু করে। আমরিকা-ইউরোপ, আরব বিশ্ব, তুর্কী সকলে এই বিদ্রোহে সমর্থন জানায়।

এর মাঝে মুসলিম ব্রাদারহুড সহ অন্যান্য ইসলামপন্থীরা মিলে ইসলামিক ফ্রন্ট গঠন করে। এর অধীনে বিভিন্ন ঘরাণার ইসলামী দলগুলো ছিল। কাতার কিংবা তুর্কী ব্যাকড দল, সাউদী ব্যাকড দল। এরা মূলত শরীয়াহ - ইসলাম ভিত্তিক বিপ্লবের জন্য যুদ্ধ করছিল। আবার ফ্রি সিরিয়ান আর্মির অধীনের ডেমোক্রেট সেকুলররাও লড়াই করছিল। বিএনপি টাইপ দল ধরেন আর কি। আমরিকা-ইউরোপেরর সাহায্যের জন্য যারা মুখিয়ে থাকে।
এই সময়টাতে একিউ, ইরাকের স্টেটকে সিরিয়ান জি-হাদকে সাহায্যের জন্য যেতে বলে। তখন ইরাকে থাকা, বিশেষ করে সিরিয়ান মু-জাহিদদের নিয়ে জাবহাতুন নুসরাহ নামে একটা দল গঠন করে সিরিয়াতে পাঠায়। যদিও আইএসের লোকেরা এটা অস্বীকার করে যে, তারা একিউর নির্দেশে এমনটা করেছিল, তাদের দাবী তারা নিজ থেকেই করেছিল। যাই হোক।

জাবহাতুল নুসরাহ খুব দ্রুতই মোস্ট ডোমিনেন্ট ফোর্সে পরিণত হল। অনেক অনেক তরুণ হিজরত করা শুরু করলো। চেচনিয়া, এমনকি তুর্কিস্তান থেকেও মু-জাহিদরা হিজরত করলো। এমনকি আফগান থেকেও অভিজ্ঞ

প্রশিক্ষকদের পাঠানো হয়েছিল। হা-মাসের সমর্থন সহযোগিতা ছিল এই বিদ্রোহে। অর্থাৎ সমগ্র সুন্নীরা একযোগে যুদ্ধে লড়ছে। ২০১২-১৩ তেই অর্ধেক সিরিয়া মু-জাহিদদের অধীনে চলে আসলো। এ এক অভাবনীয় সাফল্য। ঠিক তখন ইরাকের স্টেট দাবী করলো যে, এখন আর জাবহাতুন নুসরাহ নামে কোন দল থাকার দররকার নেই। বরং সিরিয়ার এই মুক্ত অঞ্চল দখল করে ইসলামিক স্টে-ট অব ইরাক এ্যান্ড সিরিয়া, তথা আইসিস গঠন করা হবে। তারা ইরাক আর সিরিয়ার কোন বর্ডার মানে না। এই ঘোষণা তারা ২০১৩ এর রমজানে দেয়। কিন্তু জাবহাতুন নুসরাহ সেই ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে।

একে তো মুক্ত অঞ্চল জাবহাতুন নুসরাহ একা জয় করে নি, বরং ইসলামিক ফ্রন্টও শামিল ছিল। ফ্রি সিরিয়ান আর্মিও শামিল ছিল। এখন হঠাৎ যদি বাগদাদী সকল মুক্ত অঞ্চল নিজের সাম্রাজ্য বলে দাবী করে, তাহলে বুঝেন এখানে কি রকম মতবিরোধ তৈরী হতে পারে? কিন্তু এই ঘোষণা দেয়ার আগেই বাগদাদী নিজের অলরেডি ৬ মাস আগে থেকেই সিরিয়ায় অবস্থান করে বিভিন্ন ছোট ছোট গ্রুপ থেকে বা'য়াত নেয়া শুরু করেছিল। এই ঘোষণার পর যারা স্টেট তৈরীতে আগ্রাহী, বিশেষ করে জাবহাত থেকে যারা আইসিসে যাবার, তারা অস্ত্র-সরঞ্জাম নিয়ে আইসিসে যোগদান করলো।

শুরুতে আইসিসি একটা দল হিসেবেই বাকি সবগুলো দলের সাথে মিলে বাশার আল-আসাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। কিন্তু এর ভিতরে ভিতরে তারা একটা কাজ করছিল যে, তারা মুক্ত অঞ্চলগুলো তে শরীয়াহ কোর্ট স্থাপন করতো, সেখানে তারা নিজেদের লোকদের বিচারক নিয়োগ করতো, আর বিচার করতো। কারণ তাদের মতে শরীয়াহ কায়েম করতেই হবে। কথা সত্য, কিন্তু তারা শুধু তাদের লোক নিয়োগ করতো, এবং যুদ্ধ পরিস্থিতিতে হুদুদ কায়েমের শিথিলতা মানতো না, যেনতেন ভাবে তাদের বিচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। যা অন্যান্য দলের কখনোই মানার কথা না।

আরেকটা কাজ করছিলো তারা, বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দলের কাছে গিয়ে বা'য়াত চাইতো, নতুবা ওই জায়গা ছেড়ে দিতে বলতো। এরকম একবার একটা দল করে কি, যারা বা'য়াত চাইতে গিয়েছিল, তাদের অর্থাৎ আইসিসের ৩০-৪০ জনকে হত্যা করে ফেলে। এর পরবর্তীতে আইসিসও সেটার প্রতিশোধ হিসেবে তাদের হত্যা শুরু করে। একিউর শুরুতে ইচ্ছা ছিল না নিজেদের প্রকাশ করার। তাদের ইচ্ছা ছিল ইসলামিক ফ্রন্টের দলগুলোকে ইন্টার্নালি গ্লো-বাল জিহাদের সাথে কানেক্ট করা এবং সৌদী, কতার কিংবা তুর্কী নির্ভরতা কমিয়ে আনা। কিন্তু আইসিস ঘোষণার পর, জাবহাতুন নুসরাহর আমীর আল-জুলানী, বাগদাদীর আদেশ মানতে অস্বীকার করে, শাইখ জাওয়াহারীকে বা'য়াত দেন। তার মতে বাগদাদী, শাইখ জাওয়াহিরীর অনুগত, তাই তিনি শাইখ জাওয়াহিরী যেই মত দিবেন সেটা মেনে নিবেন।

শাইখ জাওয়াহিরী নির্দেশ দেন যে, আইসিস যেন ইরাকে ফিরে যায়, আর তিনি আইসিস
সদস্যদের হত্যা করার বিরোধিতা করেন, তাদেরও এর প্রতিশোধ নেয়ার বিরোধিতা করেন। কারণ একে তো মুসলিমরা নিজেরা রক্তা-রক্তিতে লিপ্ত হয়েছে, তার উপর এটা গেরিলা যুদ্ধের নীতি বিরোধী যে, মূল যুদ্ধ ছেড়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে জড়ানো।

কিন্তু আইসিস উল্টো শাইখ জাওয়াহিরী নির্দেশ না মেনে দাবী করে যে, তারা তার নির্দেশ মানতে বাধ্য না। কারণ তারা হচ্ছে "স্টেট" আর স্টেট কখনো কোনো দলের আমীরের কথা মনাতে বাধ্য নয়। তার উপর শাইখ জাওয়াহিরী ইরাকে ফিরে যেতে বলার মাধ্যমে কা-ফিরদের বানানো বর্ডারকে মেনে নিতে বলছেন। এটা তো কখনোই মেনে নেয়া যায় না।

দেখেন তাদের হঠকারিতা। কারণ সিরিয়ার জি-হাদ সকল মু-জাহিদ স্টেক হোল্ডারদের সাথে পরামর্শ ছাড়াই তারা তাদের আমীরকে সকল মুক্ত অঞ্চলের আমীর ঘোষণা করতো পারে না। এর অর্থ হচ্ছে সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, যে-ই আসলে আমীরকে মেনে নিবে না। তার উপর স্টেট ঘোষণার যে ভুল তারা ২০০৬-২০০৭ এ একাবার করেছিল, ঠিক একই ভুল এবার তারা জোর করে সিরিয়াতেও করতে চাচ্ছে। একিউ কোনভাবেই বারবার একই ভুল মেনে নিতে পারে না।

যখন মু-জাহিদরা মুক্ত অঞ্চল রেখে সামনে এগিয়ে যেত, আইসিস পিছন থেকে সেই অঞ্চলগুলো দখল করতো, সেখানে শরীয়াহ কোর্ট বসাতো। আর মু-জহিদারা তাদের সেচ্ছাচারিতায় বাধা দিলেই তাদের সাথে সংঘর্ষ শুরু হতো। এরকম ব্যাক এ্যান্ড ফোর্থ যুদ্ধ চলতে থাকে। এর মাঝে রাক্কার শহরে একবার আইসিসের বিশাল সংখ্যাল সেনাবহর এসে, শহর পাহাড়ার দায়িত্বে থাকা জাবহাতুন নুসরাহ তথা একিউর মু-জাহিদদের আটক করে, তাদের জ-বাই করে, লাশের সাথে বেয়াদবী করে। এই জঘণ্য ছবিগুলো দেখার পরপরই মূলত আমরা অনেকে এদের সরূপটা বুঝতে পারি।

অন্যদিক থেকে আইসিসও দাবী করতে থাকে যে, তাদের সাথেও অন্যায় হয়েছে, তাদের নারীদের নাকি রেপও করা হয়েছে। মু-জাহিদরা আহবান করে, সব কিছুর বিচারের জন্য নিরপেক্ষ কোর্টে বসার জন্য। অথচ আইসিস আর তখন রাজি হয় না। তাদের মতে তারা স্টেট, তাদের কোর্টেই আসতে হবে। অথচ তাদের কোর্টে তাদের লোক, তাদের বিচারক। ঠিক যেমন লীগের নির্বাচনের মত। সব তাদের। কিন্তু মু-জাহিদরা এই প্রহসনের শরীয়াহ কোর্টে যেতে রাজি হয় না।

মু-জাহিদরা আরেকটা অভিযোগ করতে থাকে যে, আইসিস তাদের তাকফির করে। কিন্তু আইসিস তা অস্বীকার করে। কিন্তু মু-জাহিদরা বিভিন্ন প্রমাণ হাজির করতে থাকে যে, এরা শুধু এদের নেতৃত্ব মেনে না নেয়ার কারণে হত্যা করছে না, বরং এরা তাকফির করে হত্যা করছে। যেমন যারা আমরিকাপন্থী বিদ্রোহী তারা কা-ফির, মানে বিএনপি টাইপ যারা। আর তাদের যারা তাকফির করে না, ইসলামিক ফ্রন্ট মানে যারা জা'মাত-হেফজত টাইপ। তারাও কা-ফির, কারণ তারা ওই কা-ফিরকে কা-ফির মনে করে না। আবার এদের কা-ফির মনে করে না জাবাহাত তথা একিউ, অর্থাৎ এরা টেকনিক্যালী কা-ফির।

ইসলামিক ফ্রন্টের বিভিন্ন দলেও আফগান ফেরত মু-জাহিদরা ছিল। এর মধ্যে একজন হচ্ছে আবু খালিদ আস-সুরী, তিনি আহরার আশ-শামে ছিলেম, এর আগে আফগানে ওবিএলের কাছের লোক ছিলেন। ৮০ 'র দশকে সিরিয়ান জি-হাদের ছিলেন। তাকে হত্যা করা হয়, এবং সিম্পটোম্প বলে যে, আইসিসই করেছে। তারা মু-জাহিদদে বড় বড় লীডরাদের গুপ্ত হত্যা শুরু করে, যাদের আমরিকাও হত্যা করতে পারছিলো না। আর সাধারণ মু-জাহিদদের সাথে তো তাদের নৃশংশতা চলমানাই। তখন মু-জাহিদরাও বাধ্য হয় তাদের সাথে ফুল স্কেলে যুদ্ধ শুরু কররার। অথচ তারা অনেক ক্ষেত্রে দামাস্কাসের কাছে পৌছে গিয়েছিল। আইসিসের পিছন থেকে এমন ছুরি মারার কারণে বাশার আল-আসাদ যেন কিছুটা হাফ ছেড়ে বাঁচলো।

----

৮০ 'র দশকে মু-জাহিদদের পরাজিত করার জন্য ইরান হাফিজ আল-আসাদকে অনেক সহযোগিতা করেছিল। এমনও শোনা যায় যে, ইখওয়ানের লোকেরা ইরানের খোমেনীর কাছে সাহায্য চেয়েছিল, সেটার বিপরীতে ইরান তাদের থেকে তথ্য নিয়ে হাফিজ আল-আসাদকে দিয়ে দেয়, সেটা কাজে লাগিয়ে সে মু-জাহিদদের উপর ক্র্যাকডাউন চালায়।

এবার যখন মু-জাহিদরা বাশার আল-আসাদকে পরাজিত করে ফেলছিল, তখন লেবানন থেকে হিজবুল্লা তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করে বাশারকে টিকিয়ে রাখতে। এমনকি আফগান-পাকিস্তান থেকেও শিয়া তরুণদের রিক্রুট করে হিজরত করানো হয় সিরিয়ার যুদ্ধের জন্য। অর্থাৎ সুন্নী বিশ্বের মত পুরো শিয়া বিশ্ব সিরিয়াকে নিজেদের হাতে রাখার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। এবং তাদেরকে সমর্থন করতে থাকে রাশিয়া।

মুসলিম বিশ্বে একটা মজার বিষয় হল যে, ইহুদী-নাসারদের দালাল বলতে ইসরাইল-আমরিকার দালালী সাম এক্সটেন্টে ইউরোপকে বুঝালেও - রাশিয়ার দালালীকে তেমন একটা সমানে আনা হয় না। তো সিরিয়ার যুদ্ধে শিয়ারা মোটা দাগে সুন্নীদের আমরিকা-ইসরাইলের দালাল বললেও, সুন্নীরা যে শিয়াদের রাশিয়ার দালাল বলবে, এটা সুন্নীদের মাঝেই তেমন একটা মার্কেট পাচ্ছিল না। কারণ সুন্নীরা একে তো বিশাল জনগোষ্ঠি - আবার নিজেদের মধ্যে স্বার্থগত দ্বন্দ আছে। অপরদিকে শিয়ারা সংখ্যায় কম হওয়ার পরও, নিজেদের মধ্যে কমন একটা স্বার্থ বের করতে পেরেছে, তো কোন শিয়াগোষ্ঠি আক্রান্ত হলে সকল শিয়া একসাথে মিলে এর প্রতিরোধ করে।

ইরাকে তারা আমরিকার ছত্রছায়ায় সুন্নীদের উপর চরম নির্যাতন করছিল, যখন কিনা সুন্নী মু-জাহিদরাই আমরিকার বিরুদ্ধে লড়ছিলো ফুল স্কেলে। এখনো আমরিকার ঘাটি আছে ইরাকে, সুন্নীরা যুদ্ধ করতে করতে নিঃশেষ হয়ে গেছে। অথচ শিয়া-মিলিশিয়ারা এখনো ইরাকে শক্তিশালী অবস্থানে আছে, কিন্তু আমরিকান বেইসে তারা পুতুল-পুতুল হামলা খেলে।

ইরাকে আমরিকা আর ইরানের স্বার্থ একই ছিল। কিছু শিয়া গোষ্ঠি আমরিকার বিরুদ্ধে থাকলেও তারা কখনোই আমরিকার সাথে ফুল স্কেলে লড়াই শুরু করে নি। বরং কিছু হুমকি-ধামকির মধ্যেই রাখতো। আমরিকাও শিয়াদের এলাকায় কোন অভিযান চালাতো না। যা ঝড় গেসে, ইরাকের সুন্নীদের উপর দিয়েই গেছে।

কিন্তু সিরিয়াতে আবার আমরিকা আর ইরানের স্বার্থ বিপরীত মুখী। সিরিয়াতে সুন্নীরাও বাশার আল-আসাদ বিরোধী, আবার আমরিকাও বিরোধী। অথচ এক জায়গায় আমরিকার দালালী করা শিয়ার আরেকজায়গায় এসে খুব আমরিকা বিরোধী হয়ে যায়, আর সুন্নীদের দলাল বলে প্রচার করে। সুন্নীদের মধ্যে দালাল নেই, তা না - আছে। কিন্তু তারা মূলত আহলুস সুন্নাহর উপর বিদ্বেষের কারণেই এই কাজটা করে। আর এই প্রচারণায় সুন্নীদের অনেক বেকুবরাও সাড়া দেয়। যেমন ভন্ড সুফী রা, সুপ্রিমিস্ট মাজহাবীরা যখন অন্য মাজহাবকে গালি দেয়া হয়, অথচ তারা বুঝতে পারে না যে, যাদের সাথে মিলে গালি দিচ্ছে, তাদের থেকে যাদের গালি দিচ্ছে তাদের সাথে তাদের মিল বেশী। মানে আপনা ভাইয়ের সাথে জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধে নিজেদের বাপ-দাদার শত্রু এলাকার বদমাইশ নেতা-ফেতার সাথে হাত মিলানোর মতো।

সিরিয়াতে শিয়া-মিলিশিয়াদের নিশৃংস কাজ কর্মের পর ইরান এবং শিয়াদের প্রতি সুন্নীদের যাদের মোহ ছিল, তাদের মোহে ভাটা পড়া শুরু করে। উদাহরণ সরূপ, গত দশকে এই অঞ্চলে শিয়া বিষয়ক এত প্রচারণা হয়েছেই শিয়াদের সিরিয়ার কর্মকান্ডের প্রতিক্রিয়া সরূপ। নতুবা বিএনপি-জামাত আমলে তো ইরান, আহমেদিনেজাদের নাম জপতো এদেশের মিডিয়া।

এই শিয়ারা পরাজিত হচ্ছিলোই। কিন্তু আইসিসের বাড়াবাড়ি সুন্নীদের মধ্যে ফাটলের সৃষ্টি করলো। সুন্নী মু-জাহিদদের মুক্ত করা বিশাল অঞ্চল আইসিস দখল করে নেয় সিরিয়াতে ২০১৪ এর শুরুতেই। কারো প্রতি কোন দয়া না। বা'য়াত দাও নয়তো যুদ্ধ করো। ওই দিকে মু-জাহিরা সমানে থেকে শিয়া পিছন থেকে আইসিস দুই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছিলো। এরপর এখানে ক্ষমতা একটি শক্তিশালী হবার পর, তারা ইরাকে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সুন্নী অঞ্চলগুলো দখল করে ফেলে। এরপর নযর দেয়, কুর্দী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে। ঠিক এই সময়টাতে আইসিসের নাম মিডিয়াতে আসা শুরু করে।

বলে রাখা ভালো যে, কুর্দীর মূলত সুন্নী। কিন্তু বাঙালীদের মতো, তাদের মধ্যেও সেকুলার লেফটিস্ট আছে, ইসলামিস্টও আছে। এই কুর্দীদের রাশিয়া-আমরিকা উভয়ই সাপোর্ট করে। ইরাকের কুর্দী প্রশাসনের স্বায়ত্ত্ব শাসন ছিল, তারা আমরিকাকে হেল্প করেছে, যেখানে কুর্দী মু-জাহিদরা আবার আমরিকার বিরুদ্ধে লড়েছে। ইরাক-সিরিয়ায় কুর্দী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো হচ্ছে তেল ক্ষেত্রে ভরা। আইসিস কুর্দীদের থেকে তেল ক্ষেত্রগুলো দখল করা শুরু করলো। তখন আমরিকাও আইসিসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া শুরু করলো।

এইসময়টাতে আইসিস ছিল তাদের সক্ষমতার সর্বোচ্চ চূড়ায়। তারা এবার শুরু ইরাক-সিরিয়া নয়, বরং সমগ্র বিশ্ব থেকে বা'য়াত আহবান করলো। আমাদের এতসব যুদ্ধের একটা বড় গোল তো হচ্ছে খিলাফাহ ফিরিয়ে আনা। তো তারা তাদের আমীরকেই খলিফা ঘোষণা করলো ২০১৪ এর রমজানে। সারা বিশ্ব থেকে অনেক জি-হাদী দল বুঝে না বুঝে এই খিলাফত সমর্থন করা শুরু করলো। তাদের দাবী তাদের খলিফাকে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ নিয়োগ দিয়েছে। অথচ কারা এই আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ? বরং তাদের নিজেদের লোকেরাই। তারা ভেবেছিল, সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে তারা বাঁকা করবে। করলোও তাই। হঠাৎ পাওয়া শক্তির চোটে তারা এতই অহংকারী হয়ে উঠলো যে, সবার সাথে শত্রুতা, গায়ে পড়ে যুদ্ধ করা শুরু করলো। যেন জোর করে ক্ষমতা নিয়ে নিবে। নিতে পারলেও হতো। ইয়াজিদ, হাজ্জাজরা নিয়েছিল না - পরে যখন উমাইয়ারা স্থিতিশীলতা এনেছিল, তখন সকলেই তাদের খিলাফাহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল জালিম। আইসিসও যদি উমাইয়াদের মত পারত

অঞ্চলের পর অঞ্চল দখল করে ইসলাম ও মুসলিমদের হুরমত রক্ষা করতে, তাহলে তারাও হয়ত খিলাফত হিসবে উম্মতের মধ্যে স্বীকৃতি পেতো। কিন্তু তারা সেটা পারে নি।

যতদিন আইসিস মু-জাহিদদের বিরুদ্ধে লড়ছিলো, আমরিকা চুপ-চাপ দেখছিল। আইসিস যখন মু-জাহিদদের শক্তি একেবারে খর্ব করে নিজের সুপার সনিক গতিতে শহরের পর শহর দখল করা শুরু করেছিল, তেল ক্ষেত্রগুলো দখল শুরু করলো, তখনই আইসিসের উপর আমরিকা এয়ার স্ট্রাইক শুরু করলো। কারণ এতদিন আইসিসের কাজ আমরিকার পক্ষেই যাচ্ছিল, তারা বড় বড় মু-জাহিদ নেতাদের হত্যা করছিল। এখন যখন তাদের মিত্র কুর্দী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আইসিসের লড়াই শুরু হলো, তখন আমরিকাও আইসিসকে ভিলিফাই করে মিডিয়াতে শোরগোল শুরু করলো। আর আপনারা সেই সুবাদে আইসিস কত খারাপ, তা জানতে পেরেছেন।
এখানে তুর্কী আবার কুর্দী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে। আইসিসও বিরুদ্ধে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তুর্কী আর আইসিস একমত। তুর্কী বরং আইসিসের কুর্দীদের উপর আগ্রাসন সমর্থনই করছিল। কিন্তু অন্যান মু-জাহিদদের সাথে সংঘর্ষে তুর্কী আইসিসের পক্ষে ছিল না, মু-জাহিদদের পক্ষে ছিল। কিন্তু আমরিকা যখন কুর্দী বিদ্রোহীদের আইসিসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা শুরু করে আইসিসকে হটিয়ে দিল, তখন তুর্কী সুন্নী মু-জাহিদদের বললো এই কুর্দীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, এবং তারা তাই শুরু করলো। কিন্তু একিউ তুর্কীর এই সিদ্ধান্তের পক্ষে ছিল না।
কুর্দী বিদ্রোহীরা আমাদের শত্রু এটা সত্য। কিন্তু সিরিয়ার মু-জাহিদরা বাশার আল-আসাদের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার বদলে তুর্কীর শত্রু কুর্দীদের বিরুদ্ধে লড়ার অর্থ হচ্ছে আরেকটা পার্শ্বীয় যুদ্ধে জড়ানো। অর্থাৎ আইসিস যেই ভুলটা করেছিল স্ট্র্যাটিজক দিক থেকে, অন্যান্য সুন্নী মু-জাহিদরাও একই ভুলই করছে। এটা নিয়ে একিউ এবং অন্যান্য গ্রুপগুলোর মধ্যে ব্যাপক টেনশন শুরু হয়।

আইসিসের আগ্রাসনের পরও ইদলিব, আলেপ্পো সহ আরো কিছু অঞ্চলে সুন্নী মু-জাহিদদের শক্ত অবস্থান ছিল। আমরিকা আইসিসের উপর হামলা শুরু করার পর। রাশিয়াও এইদিকে মু-জাহিদদের উপর হামলা শুরু করে। আবার কখনো কখনো রাশিয়া আইসিসের উপর কিছু হামলা করে, আমরিকাও মু-জাহিদদের উপর কিছু হামলা করে। তখন সুন্নী মু-জাহিদ গ্রুপ গুলো একিউর উপর প্রশ্ন তোলে যে তাদের কারণেই আমরিকা-রাশিয়া এসে তাদের উপর এয়ার স্ট্রাইক করছে। প্রচন্ড চাপের মুখে জাবাহতুন নুসরাহ একিউর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ফেলে। এদিকে রাশিয়া-ইরানের সাপোর্টে বাশার আবার শক্তিশালী হতে থাকে। সৌদী ব্যাকড দলগুলো আত্মসমর্পন করে। মূলত এই পর্যায়ে এসে আমরিকা বাশারের সাথে একটা ডিলে আসে যে, আমরিকা বাশারকে ফালানোর আর চেষ্টা করবে না। সেই অনুযায়ী আমরিকার দালাল রাষ্ট্রগুলো তাদের সমর্থন সরিয়ে নেয়। আর ওইদিকে এরদোগান আরেক গেইম খেলা শুরু করে। সুন্নী মু-জাহিদদের উপর একিউর যে প্রভাব তৈরী হচ্ছিল সেটা নস্যাৎ করতে সে, একিউকে সিরিয়া থেকে বের করার উদ্যোগ নেয়। তুর্কী থেকে আমরিকান বেইসগুলো থেকে ফাইটার, ড্রোন উড়ে এসে একিউর কমান্ডারদের হত্যা করতে থাকে।

এরদোগান আলেপ্প, হামা, হোমস এসব অঞ্চল বাশারের হাতে তুলে দেয়। তার গেইমটা হল যে, সে মু-জাহিদদের ততটুকু সমর্থন করে, যতটুকু করলে তারা টিকে থাকে, কিন্তু ততটুকু সমর্থন করে না, যা করলে তারা জিতে যায়। এরকম করে যেন, মু-জাহিদদের নিজের স্বার্থে কাজে লাগানো যায়। তুর্কী যদি এন্টি এয়ার মিসাইল দিতো, তাহলে মু-জাহিদদের বিরুদ্ধে রাশিয়া কিংবা আমরিকার বেগ পেতে কষ্ট হত, কিন্তু তুর্কী তা দেয় নি। এখন মু-জাহিদরা এত এত ভূমি মুক্ত করার পরও শুধু ইদলিবে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। আর তুর্কীর কথায় উঠতে বসতে হয়। জি-হাদ ইস্তিমিত হয়ে গেছে, কিন্তু সময়ে সময়ে শিয়া-রাশিয়াদের আক্রমণ ঠিকই চলে। কিন্তু তুর্কীর প্রতি নির্ভশীলতা এর জবাব দিতে দেয় না। এবং এসব থেকে বের হয়ে আসতে চাওয়ার কারণে একিউপন্থীদের চরম নির্যাতনের মুখে পড়তে হচ্ছে।

ওইদিকে আইসিসের এলাকাগুলোতে তো তাদের কোন এয়ার ডিফেন্স নেই। আমরিকা শহরের পর শহর শুধু বম্বিং করেই মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। সেই এলাকাগুলো এখন কুর্দী বিদ্রোহীদের দখলে। রাজনৈতিক বিজয়, চুক্তি ছাড়া এভাবে প্রকাশ্যে চলে আসলে এমনই হবার কথা ছিল, এমনটাই হয়েছে।

আইসিস যে সময়টুকুতে ক্ষমতায় ছিল, তারা এমন কি কি করেছিল যে, জনগণ তাদের সমর্থন করে নি? এর বড় একটা কারণ হল, তারা স্থানীয়দের সমর্থনের তোয়াককা করতো না। তারা ভাবতো, তারা যেহেতু হক্ব, তো বাতিলের সাথে যে কোন প্রকারের সমঝোতাই হচ্ছে দ্বীন বিরোধি কাজ। আর তখন এত অর্থ-সম্পদ আর শক্তি ছিল যে, তাদের আর অন্যদের সাথে সমোঝতা করার মন মানসিকতা ছিল না।

তারা যে বিভিন্ন জায়গায় কোর্ট বসাতো, সেখানেও তাদের নিজদের লোক। প্রশাসক নিজেদের লোক, বিদেশী লোক। এই যেমন ধরুণ সিরিয়ার কোন গ্রামে ইরাকের কাউকে নিয়োগ দিলো, এমনকি একেবারে ভিন্ন জাতির কাউকে। এগুলো স্থানীয়রা কখনোই ভালো চোখে দেখতো না।

আফগানে একিউ কখনোই প্রশাসক তো দূরের কথা, বিচারকও সাজতে যায় নি। এমনকি আফগান মু-জাহিদরা বিভিন্ন সময়ে নিজেদের মধ্যে মতোবিরোধের সময় শাইখ ওবিএলকে ডাকতো মধ্যস্থতার জন্য। তিনি সর্বদা এসব এড়িয়ে চলতেন। এটা হচ্ছে রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রজ্ঞা। এরপরও কিন্তু আফগানের একটা অংশ একিউর উপস্থিতি পছন্দ করতো না। শাইখ আযযাম তো হানাফী ফিক্বহ অনুযায়ী নামাজ পড়তে বলেছিলেন যেন এগুলো নিয়ে মুনাফিক এবং তাদের ধোঁকায় পড়া লোকরা কোন কোন্দল তৈরী করতে না পারে। এমনকি এখনো একিউর যেসব লোকজন ইমারাহর বিভিন্ন পোস্টে আছে, তারা সকলেই স্থানীয়। একিউর কোন মুহাজির সদস্য অফিশিয়ালি ইমারতের কোন পোস্টে নেই। যারা আছে তারা সকলেই স্থানীয় সদস্য। একিউ ভারতীয় উপমহাদেশ শাখাও ভারতীয়, পাকিস্তানী এদের দিয়েই তৈরী করেছে। অন্যান্য জায়গার জন্যও একিউর একই পলিসি। এটা এজন্য নয় যে, একিউ কা-ফিরদের তৈরী বর্ডারকে স্বীকৃতি দেয়। বরং এই জন্য যে, যেন স্থানীয়দের সাথে কো-অপারেট করা যায়, কোন ভুল বুঝা-বুঝি কোন্দল তৈরী না হয়।

আইসিসের আরেকটা সমস্যা ছিল যে, তারা তেল খুব পছন্দ করে। যারা তেল মারতে পারে তারাই ভালো পদ পায়। এটা শুধু আইসিসের একার সমস্যা বললে ভুল হবে, এটা আমাদরে সবার সমস্যা। তবে আইসিস এমন একটা পর্যায়ে ছিল, তখন এরকম দোষগুলোও কখনো কখনো অস্তিত্বের জন্য হুমকি সরূপ হয়ে পড়ে। এই সমস্যা তাদের ইরাক থেকেই ছিল। সিরিয়াতেও কন্টিনিউ করতে থাকে। খিলাফাত ঘোষণার পরও তারা স্বীকার করছিল না যে তারা তাকফির করে বাকি মু-জাহিদদের। বরং তাদের সমর্থকরা এই যুদ্ধকে আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা) এর যুদ্ধের সাথে তুলনা করছিলো। এমনকি যেই রাক্কায় তারা একিউর মু-জাহিদদের জবাই করছিল, সেই রক্কার সিফফিনেই আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা) এর মাঝে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল।

কিন্তু আইসিস আর একিউ সহ অন্যান্য মু-জাহিদদের মাঝে এই যুদ্ধ কখনোই আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা) এর মত ছিল না। কারণ তারা একে অপরকে তাকফির করতেন না। বরং তাদের উভয়কেই তাকফির করতো খারিজীরা, ঠিক যেমনটা আইসিস, একিউ এবং একিউ না এমন মু-জাহিদ সকলকেই তাকফির করে। এই তাকফির করার বিষয়টা তাদের বিভিন্ন বার্তায় ফুটে উঠতে থাকে। তাদের কথা ছিল এমন যে কেউ তাদের খিলাফত মেনে নিবে না, তারা ইসলামের শত্রু, তাদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করবে। অথচ দিন শেষে কা-ফিরদের বিরুদ্ধেই নিজেদের টিকাতে পারলো না।

তাদের খিলাফত যদি সঠিকও হতো, তবুও সেটা মেনে না নেয়াটা কখনোই
কাফির হওয়া কিংবা ইসলামের সাথে শত্রুতা না। সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ভুল হতে পারে। যেমনটা মুয়াবিয়া (রা) আলী (রা) এর খিলাফত মেনে নেন নি, সেটা রাজনৈতিক ভুল ছিল। এর কারণে কেউ কাফির তো দূরের কথা, আহলুস সুন্নাহ থেকেও বের হয়ে যায় না। কিন্তু তারা এমনটাই মনে করতো, এরপর তাদেরকে যারা বা'য়াত দেয় নি, তাদের যারা বিরোধিতা করে, তাদের বিভিন্ন দোষ কখনো আসলেই কুফর, কখনো কবীরা গুনাহ এমনকি কখনো কখনো তাদের ভালো কাজের জন্যও তারা তাকফির করতো।

এখন যেমন তাদের দাওয়াতের মূল ফোকাসই হল, যেসব তরুণরা অলরেডি জি-হাদের প্রতি মোটিভেটেড - তাদেরকে টার্গেট করে অন্যান্য জি-হাদী দলের বিরুদ্ধে চোগলখোরী করে তাদের মন বিষিয়ে তোলা, আর

নিজেদের দলে ভিড়ানো। তারপর কোন একটাকে দিয়ে আবেগে চোটে কোনো একটা হামলা করিয়ে দায় স্বীকার করা। তাদের কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক কোন ফ্রন্ট নেই।

অনেক সময় দেখা যায় যে, তাদের স্থানীয় সমর্থকগুলা তাদের ইরাক-সিরিয়ার মূল লোকদের থেকেও বেশী উগ্র। যেমন এই দেশের একটার সাথে কথায় কথায় বলছিল। মাওলানা আতিকুল্লাহ এত খিলাফত সমর্থন করে কি হবে, তারা তো আক্বীদাই ঠিক নেই। অথচ মাওলানার আতিকুল্লাহ দাঈশের পক্ষে কতদিন সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছিলো একটা সময়। অনেক সালাফিরা দাঈশের প্রতি একটু নরম থাকে এটা সত্য, এইজন্য তারা তাদের সমর্থন দিয়েছিল, অনেকে এদের আসল চরিত্র না জেনেই।

এদের আরেকটা সমস্যা হল এদের সবাই নেতা। হঠাৎ ইসলাম বুঝা শুরু করেছে। একটু আক্বীদা শিখেছে ব্যস। একএকজন বড় শাইখ। দাওয়াত দেয়া অবশ্যই ভালো, কিন্তু আমরা অনেক সময় শতয়ানের ধোঁকায় অহংকারে পড়ি, আমাদের মধ্যে যাদেরকে আমরা "জাহিল" বলছি, তাদের জন্য দরদটা আর কাজ করে না। এটা শুধু আইসিসের ক্ষেত্রে না, বাকিদের জন্যও সত্য। কিন্তু আইসিসে এরকম রক্তগরম তরুণরা বেশী সুবিধা পায়। কারণ এদের ভক্তরাও এদের তেল মারা শুরু করে, এরা ভাবে যে মুই কি হনুরে! আমি তো আক্বীদায় ইমাম নববী কিংবা ইমাম ইবনু হাজার আসকালানীর চাইতেও বেশী বুঝে ফেলেছি। আমরা ব্যাখ্যাই ইমাম ইবনু তাইমিয়ার আক্বীদার একমাত্র ব্যাখ্যা, আমিই ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের যোগ্য উত্তরসুরী। হ্যাঁ কেউ কেউ সত্য তা হতেই পারে। কিন্তু সেটার সার্টিফিকেট সে নিজ থেকে নিজেকে দিলে তো হবে না, এরকম যোগ্য কারো সনদ লাগবে, আবার সনদ দাতারও তেমন সনদ লাগবে।

আমি বার্ন আউট (*) সালাফীদের মত বার্ন আউট আইসিস অনেক দেখেছি। ব্রিটিশ বাঙালী মেয়েটার কথাই ধরুণ, যে এখন কুর্দী বিদ্রোহীদের কাছে আশ্রিত-বন্দী - কিন্তু তারা দ্বীনের বুঝ পরিপূর্ণ হবার আগেই সে হিজরত করেছে, কষ্ট করেছে - কিন্তু যথেষ্ট ইলম ছিল না - এখন এমন পরীক্ষায় যে, নিজের লেবাসটাও আর ইসলামী রাখতে পারছে না। বাড়ি ফেরার জন্য হলেও ওয়েস্টার্ন ড্রেস পরছে। শুধু সে না, পশ্চিমের অনেক রিভার্টেড মেয়েদের এই অবস্থা। আইসিসের লোকেরা এদের নিয়ে এসেছে, এরাও আবেগে ঝাপ দিয়েছে, এখন তারা মনবেতর জীবন-যাপন করছে কুর্দীদের কারাগারে।

আমি বলছি না, ফিক্বহী ভাবে এমন হিজরত করা জায়িজ না। কিন্তু আইসিস যেভাবে এদের ডেকে আনলো, যেভাবে এদের অনেককে নেতৃত্বের আসনে বসালো - এগুলো ম্যানেজমেন্টের ব্যর্থতা, প্রজ্ঞার অভাবই প্রমাণ করে। তাদের লোকদের অবস্থা বাপ-মা ছাড়া এতিমের মত। যে যেভাবে পারছে ইউস করতে। তেল মারলেই যেহেতু গলে যায়, এদেরকে গোয়েন্দ সংস্থাগুলোও ম্যানুপুলেট করতে পারছে, যা আমরা আফগানে এদের ধরাপড়া সদস্যদের সীকারোক্তি থেকে জানতে পারি।

এরা কথায় অনেক আদর্শবাদী হলেও, বাস্তবে এরা ততটা আদর্শবাদী না। এরা খুব সহজেই ভেঙে পড়ে, এদের ধৈর্য শক্তি কম। সবকাজে তাড়াহুড়ো করারা চেষ্ট করে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এদের মধ্যে উম্মাহর জন্য দরদটা আমি দেখি নি। একটা রক্তপিপাষু ইনসটিংট এদের মধ্যে কাজ করে। আইসিস না এরকম অনেকের মধ্যেও এই বিষয়টা আছে, হতে পারে এরা নেক্সট আইসিস হবে, আল্লাহ না করুক।

এরা চুক্তি করাকে অবৈধ মনে করে। আপনি সব ফ্রন্টে সর্বদা যুদ্ধ করার জন্য সামর্থবান নাও হতে পারেন। তাই কোন কোন শত্রুর সাথে চুক্তি করে, তাদের সাথে যুদ্ধবিরতিতে যাওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ না। চুক্তির সীমারেখাগুলো নিয়ে ফক্বীহরা বিস্তর আলোচনা করেছেন। সকল শত্রুর মধ্যে আমরিকাকে বেছে নেয়ার একটা কারণ ছিল, সব ফ্রন্টে আমাদের যুদ্ধ করারা সামর্থ নেই। তাই সীমতি সামর্থ্যে সবচাইতে বড় শত্রুটাকে দূর্বল করার জন্য একিউ আমরিকাকে প্রথমে সাপের মাথা হিসেবে টার্গেট করেছিল।

চীনও আমাদের অনেক বড় শত্রু। কিন্তু চীনের বিরুদ্ধে এখনোই কোন বড় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না, কারণ আগে আমরিকার মত শত্রুগুলো প্রভাব-প্রতিপত্তি মুসলিম বিশ্বে খতম হোক। এভাবে শিয়াদের ক্ষেত্রেও। তারা তো

উম্মতের মুনাফিক। আইসিস চায় তারা যেণাবে শিয়াদের ক্ষেত্রে আচরণ করে, বাকিদেরও সেভাবে আচরণ করতে হবে, নতুবা তারাও শিয়াদের বন্ধু হিসেবই বিবেচিত হবে। যেমন ইমারাহ শিয়াদের, কিংবা সেকুলারদের, গণতান্ত্রিকদের বিভিন্ন স্তররের মু-নাফিক হিসেবে ট্রিট করে। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম) ঠিক যে কারণে মদীনার মুনাফিকদের সরাসরি তাকফির করে মৃত্যুদন্ড দেন নি, ঠিক সে কারণেই ইমারাহ শিয়া কিংবা সেকুলারদের সরাসরি তাকফির করে মৃত্যুদন্ড দেয় না, বরং তাদের মুনাফিক এবং জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরেরই মনে করে। তবে হয়ত এদের বিভিন্ন প্রকারের মু-নাফিকদের বিভিন্ন স্তর আছে।

ইসলামে মুরতাদ-মুনাফিক দুইটা টার্মই আছে। এজন্যই আছে যে, এদের বিরুদ্ধে প্রশাসন যেন এমনভাবে ম্যানুভার করতে পারে, যেন তাদের আক্বীদাও নষ্ট না হয় - আবার রাজনৈতিক স্বার্থও বলবৎ থাকে। যেমন বিদ্রোহের দানা বাঁধতে না দেয়া ইত্যাদি। শিয়া কিংবা সেকুলাররা অস্ত্র না ধরলে তাদেরকেও বাঁচতে দিবে ইমারাহ। তবে তাদের সাথে ইলমী লড়াই চলবে। তাদের উপর রিদ্দার হদ কায়েম করতে হলে, ইন্ডিভিজুয়ালী আদালতে তাদের ব্যক্তিগত রিদ্দা প্রমাণ করতে হবে। এমনিতে প্রকাশ্যে সকল রকম কুফর-শিরকের বিরুদ্ধে খিলাফতকে নিষেধাজ্ঞা জারী করতে হবে। গণহত্যার হুকুম খিলাফত আসলে দিতে পারে না, যদি না তারা নিজেরাই অস্ত্র না ধরে বিদ্রোহ করে। কিন্তু আইসিস সহ আরো অনেকের ধারণা এমন যে, একবার ক্ষমতা পাইয়া নি, শিয়া, সেকুলারদের একেবারে গণহারে হত্যা করা হবে। বিষয়টা এমন না। ইমারাহ এমনটা করছে না, করবেও না।

* বার্ন-আউট হল একটি সিনড্রোম যা দীর্ঘস্থায়ী চাপের ফলে হাল ছেড়ে দেওয়া। যারা দ্বীনের বিষয় অহেতুক কড়াকড়ি নিজের উপরে আরোপ করে তাদের অনেকে দ্বীন থেকেই সরে যায় অনেকটা। এমনটা নিয়মিত ঘটছে।

আগের পর্বগুলোতে আইসিসের কৌশলগত ভুলের কথা বেশী আলোচনা করেছি আক্বীদাগত ভুলের বদলে। একিউ কৌশলগত ভুল করা দলগুলোর সাথে কাজ করতে আগ্রহী, কারণ কৌশল পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু কারো আক্বীদাগত ভুল - তা যদি হয় উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর একিউ চাইলেও আসলে তাদের সাথে মিলে কাজ করা সম্ভব নয়। যেমন আই-এস এবং শিয়া-রাফিযীরা। অনেক সময়ই এদের সাথে ইমারাহ এবং একিউর ইন্টারেস্ট মিলে যাবে তখন এদের কোন ক্ষতি চাইবে না একিউ - কিন্তু যখন ইন্টারেস্টে কনফ্লিক্ট থাকবে, এদের বাঁচতে একিউ শ্রম নষ্টও করতে চাইবে না।

আই-এসের যে আক্বীদাগত ত্রুটি, সেটা আই-এস থেকে শুরু হয় নি, বরং আরো আগে থেকেই ছিল। যেমন আলজেরিয়ার জিআইএ - তাদের কাছে একিউ পাঠানো প্রতিনিধিদের তারা কারাবন্দী পর্যন্ত করে রাখে। এমনকি তারা একিউর কাজ শিথিলতা বলে তখন থেকেই পছন্দ করতো না। কিন্তু নয়-এগারোর পর একিউ একটা বড় প্লাটফর্ম হয়ে দাড়ায়। সকল ধরণের জি-হাদীরাই চেষ্টা করতে থাকে এটির সাথে নিজেদের এ্যাসোসিয়েট করতে। কিন্তু যখনই তারা নিজেদের একটা অবস্থান তৈরী করতে সক্ষম হয়, তারা নিজেদের আসল রঙ দেখানো শুরু করে।

মধ্যমপন্থার দুইদিকে দুইটা বিপথগামী জি-হাদী ধারা আছে। একটা হচ্ছে যারা তা-গুতদের সাথে লিয়াজু করে জি-হাদ করতে চায় - হ্যাঁ তাদের কিছু লজিকাল স্ট্রাটিজিকাল ক্লেইম আছে ঠিকই - কিন্তু বেশীরভাগ সময়ই তারা তা মেইন্টেইন করতে না পেরে তা-গুতের প্রক্সিতে পরিণত হয়। অপরদিকে সকলকে একত্রে শত্রু বানানোর নীতি থেকে চেইন তাকফিরের ফিতনার কারণে জি-হাদী দলগুলো খারিজী হয়ে যায়।
আই-এস হল এমনই একটা খারিজী দল যারা চেইন তাকফিরকে তাদের একটা অস্ত্রে পরিণত করেছিল প্রতিযোগী মুসলিম-গোষ্ঠিগুলোকে পরাজিত করার জন্য। আই-এস অন্যান্য ইসলামপন্থীদের তাকফির করার কারণ হল সদস্য-সমর্থকদের চোখে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বৈধতা দান করার জন্য - নিজেদের একমাত্র বৈধ মুসলিম শক্তি প্রমাণ করার জন্য।

অনেকে ক্লাসিকাল খারিজীদের সাথে আই-এসের কিছু মিল অমিলের তুলনা দিয়ে তাদের খারিজী প্রমাণের চেষ্টা করে, আবার অনেকে তা থেকে তাদের খারিজী না প্রমাণের চেষ্টা করে। এর বড় একটা উদাহরণ হল, ক্ল্যাসিকাল খারিজীরা কবীরা গুনাহর কারণে তাকফির করতো। বাস্তবতা হচ্ছে ক্লাসিকাল খারিজীরাও কিছু কবীরা গুনাহর

কারণে তাকফির করতো, কখনো কখনো গুনাহ না উল্টা ভালো কাজের জন্যও তাকফির করতো। যেমন আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা) নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়ে সালিস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিশ্চয়ই ভালো কাজ করেছিলেন, কিন্তু খারিজীদের চোখে তা শুধু খারাপই নয়, বরং কুফর ছিল। পরবর্তীতে খারিজীদের ঈমান-কুফরের সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে কবীরা গুনাহর কারণে তাকফির করার চর্চা শুরু করেছে। কিন্তু শুরুরতে তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এমন ভালো কাজের কারণেও তাকফির করেছে।

এর বিপরীতে আই-এসের লোকেরা অনেক রকম কবীরা গুনাহর উদাহরণ দিয়ে দাবী করে যে, তারা তো এগুলোর জন্য তাকফির করে না। যেমন তারা বলবে, কেউ জিনা করলেই তো আইসিস তাদের তাকফির করে না, কিংবা অন্য কোন কবীরা গুনাহর জন্য তো তাকফির করে না। তাহলে তারা কিভাবে খারিজী? বাস্তবতা হল, তারা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় - এমন ভালো কাজের জন্যও তাকফির করে। এবং তাদের পছন্দ নয় এরকম খারাপ কাজের জন্যও তাকফির করে। কা-ফিরদের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি এবং সাধ্যমত মজলুম মুসলিমদের সাহায্য না করার জন্যও তারা তাকফির করে। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের পান থেকে চুন খসলেই সেটা দিয়ে তারা তাকফির করে, জরুরী না সেটা কবীরা গুনাহ।

যেমন সিরিয়াতে একিউ একবার সেকুলার একটি দল থেকে বা'য়াত নিয়েছিল। মানে সেকুলার দলটি একিউর অনুগত্য করবে, তো এটা কি খারাপ কাজ? একটা সেকুলার দল শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এমন দলের অনুগত হলে সেটা তো সাধুবাদ জানানোর যোগ্য। কিন্তু আই-এস এই বা'য়াত নেয়ার জন্যই একিউর ওই দলটাকে তাকফির করেছিল, তারা নাকি কা-ফির সেকুলারদের সাথে মিলে গেছে। বাস্তবতা হল যে, আইসিস এফএসের একটা দলকে সাইজ দিতে আসে। একিউ গিয়ে তাদের ক্যাম্পে নিজেদের পতাকা তুলে তাদের থেকে বা'য়াত নিয়ে নেয়। একিউর ধারণা ছিল যে, অন্তত একিউকে তাকফির করে তারা হত্যা করবে না, এই সুযোগে এফএসএর কিছু লোক বাঁচলো। অথচ ঘটলো উল্টা ঘটনা।

অর্থাৎ ক্লাসিকাল খারিজীদের সাথে হুবুহু সব বিষয়ে মেলাটা জরুরী না। বরং মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো মিললেই হল। আর তা হল, মুসলিমদের অন্যায়ভাবে কা-ফির আখ্যা দিয়ে হত্যা করা। চেইন তাকফির করা। এগুলোর পরের বৈশিষ্ট্য হল, তারা মুশরিকদের ছেড়ে দিবে - আহলুল ইসলামদের হত্যা করবে।

এখন আইসিস কি কখনোই মুশরিকদের সাথে লড়াই করে না? করে, কিন্তু তাদের মেইন ফোকাস হল প্রতিপক্ষের মুসলিমদের সাথে লড়াই করা, আগে তাদের শেষ করা। আই-সিস শিয়া ও সেকুলারদের সাথেও লড়াই করে। তবে এই লড়াইয়ের সূরতটা কেমন হবে, সেটা হল কৌশলগত পার্থক্য - এর কারণে তাদেরকে খারিজী বলা হচ্ছে না একিউর পক্ষ থেকে। বরং তাদের অবৈধ তাকফির এবং এর উপর চেইন তাকফির করে সেই সব মুসলিমদের হত্যা করা, কিংবা হত্যা করা বৈধ মনে করার ভিত্তিতে তাদের তা-খরিজ করা হচ্ছে তাদের।

খারিজিয়াত হল জি-হাদী দলগুলোর বাই প্রোডাক্ট। খারিজী এলিমেন্ট আধুনিক জি-হাদী দলগুলোতে থাকবেই। শুরুতে তারা বিচ্ছিন্ন আলাদা আলাদা থাকে। ধীরে ধীরে জমা হতে থাকে। ঠিক যেভাবে চিনি পানিতে মেশাতে থাকলে একটা সময় পাত্রের তলায় অতিরিক্ত চিনি জমা হয়। একটা সময় এটা স্পষ্ট হয় যে, দুইটা আলাদ এনটিটি আছে এখানে। এবং খারিজীরা যখন যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে যায়, তারা সেই জি-হাদী দল থেকে বের হয়ে যায়। যখন খারিজীদের শক্তিশালী কোন দল থাকে না। তারা বা এই প্রকারের লোকেরা তখন জি-হাদী দলগুলোতে ঢুকতে থাকে। এবং ঢুকতে ঢুকতে যখন অতিরিক্ত হয়ে যায় তখন প্রথম প্যারায় যা বললাম, সেটার পুনরাবৃত্তি হয়।

আজকে কথা বলবো আইসিসের সমর্থকদের ধরণ নিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই আইসিসের সব সমর্থক সেইম না, তাদের মধ্যেও মতভেদ আছে, উগ্রতার মাত্রা আছে। এই যেমন কেউ কেউ একিউকে তাকফির করে না, আবার কেউ কেউ একিউর বিভিন্ন গ্রুপকে তাকফির করে না। কেউ কেউ জনগণকে তাকফির করে না, আবার কেউ কেউ করে।

কিন্তু তাদের মূলে যারা আছে, তারা মোটামটি সকলকেই তাকফির করে তারা নিজেদের ছাড়া। নেতৃত্ব পর্যায়েও মতভেদ হয়। হাযমী নামক একটা গ্রুপ আইসিসের মধ্যে, তারা তাকফির করতে করতে - একটা পর্যায়ে বাগদাদীকেই তাকফির করে। সেই গ্রুপটাকে আইসিস নিজেই খারিজী ফতওয়া দিয়ে সাইজ দেয়।

তারপর বোকো হারামের কথা ধরুন। তাদের মূল অংশটাই আইসিসকে বা'য়াহ দেয়। ছোট একটা অংশ একিউর সাথে সহমত থাকে। কিন্তু এই বড় অংশটার নেতা ছিল আবু বকর সেকাউ। বিভিন্ন অদ্ভুত, এবং হাস্যকর কাজের জন্য সে মোটামুটি পরিচিত ছিল। তার এক্সেসিভ তাকফিরের কারণে আইসিসের লোকেরাই তাকে হত্যা করে এবং তারা গ্রুপকে দমায়। আমি তাদের একজনের সাথে কথা বলেছিলাম যে, কেন আবু বকর সেকাউকে হত্যা করা হল? তারা জবাব ছিল, সে জনগণকে তাকফির করতো, জনগণের সাথে সীমালঙ্ঘণ করতো। আমার ধারণা সে আইসিসের নেতৃত্ব পর্যায়ের কাউকে হয়ত তাকফির করেছে। এছাড়া সীমালঙ্ঘনের বিষয়টা তো আছেই। এমনিতে আইসিসের লোকেরা নিজেদের সমর্থকদের পড়ানোর সময় শিখায় যে, তারাও জাহালাতের ওজর দেয়, তাবীলরে ওজর দেয়, জোর-জবরদস্তি উপায়হীনতার ওজর দেয়। কিন্তু বাস্তবে তাদের লোকেরা এটার উপর আমল করে না। বিশেষ করে তাদের প্রতিপক্ষদের বেলায়। তাকফিরকে তারা একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের জান-মাল হালাল করার জন্য।

এমনকি সর্বযুগে নতুন খারিজীরা পূর্বের খারিজীদের খারিজীই মনে করে। যেমন বর্তমান দাঈশ, GIA কে খারিজীই মনে করে। তেমনি আরো ১০-২০ বছর পর যারা খারিজী হবে, তারাও তখন দাঈশকে খারিজীই মনে করবে। এই কথাটা লিখে রাখতে পারেন। এমনকি শাইখ আবু মুসা'আব আস-সুরীও এমন প্যাটার্নের কথা বলে গেছেন। এখন তারা দূর্বল অবস্থায়, তাই এদের নিষ্ঠুরতা অনেক ক্ষেত্রে বুঝা যাচ্ছে না। কিন্তু যখনই তারা শক্তি অর্জন করে, তারা নিকটস্থ শত্রুদের সাথে, তথা তাদের ভাষায় মুরতাদদের সাথে সর্বশক্তি নিয়ে যুদ্ধ করে। কারণ তাদের মতে মুরতাদদের কুফর কাফির আসলির চেয়েও বেশী আর কুরআনে নিকটস্থ কা-ফিরদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অনেকে একিউর ব্যাপারে অভিযোগ করে, একিউ নিকস্থ কা-ফিরের বদলে দূরবর্তী কা-ফির তথা আমরিকার সাথে যুদ্ধ করে কুরআনের আয়াতের বিপরীত কাজ করছে। বিষয়টা আসলে তা নয়। একিউ নিকটস্থা মুরতাদদের গডফাদার তথা আমরিকাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল যেন এই নিকটস্থ শত্রুরা দূর্বল হয়ে যায়। অর্থাৎ নিকটস্থ কা-ফিরদের সাথে যুদ্ধের অংশই হচ্ছে গ্লোবাল জি-হাদ।

অনেক লোকাল জি-হাদী গ্রুপগুলোর সাথেও এই ব্যাপারে একিউর দ্বিমত আছে। যেমন সিরিয়ার কিছু জি-হাদী দলগুল মনে করে একিউর সাথে আমরিকার শত্রুতা লোকাল জি-হাদকে বাধাগ্রস্ত করছে। যদি আমরিকার সাথে শত্রুতা না থাকতো, তাহলে আমরিকা সিরিয়ার জি-হাদীদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতো না। আর জি-হাদীরা শিয়াদের সাথে আমরিকার বাঁধা ছাড়াই যুদ্ধ করতে পারতো। এই একটা যুক্তিতে সিরিয়ান জি-হাদের একিউ তার অবস্থান হারিয়েছে। একিউ কোনভাবেই আমরিকার সাথে কোলাব করতে রাজি না। আর তাদের দোহাই দিয়ে আমরিকাও এয়ার স্ট্রাইক করার অজুহাত পেয়ে যায়।

কাশ্মিরের ক্ষেত্রেও একিউর সাথে স্থানীয়দের দ্বিমতের জায়গাটা ছিল, একিউর লক্ষ্য তো আমরিকার পতন, কিন্তু কাশ্মীরিদের তো ভারতকে নিয়ে বেশী চিন্তা। তাহলে এ দুইটার সমন্বয় কি? সমন্বয় হল, আন্তার্জাতিক সাপের মাথা আমরিকার কিছু রিজনাল মিত্র আছে যারা মুসলিমদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, তাদের সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধ গ্লোবাল জি-হাদের বাহিরে নয়। যেমন পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর দুনিয়াদারিতা, ট্রেচারীর কারণে কাশ্মিমীরী জি-হাদীরাও পাকিস্তানের বদলে একিউর দিকেই ঝুকে পড়ছে।

হা-মাসের সাথেও একিউর একটা মতপার্থক্যের জায়গা ছিল আমরিকার সাথে সম্পর্ক নিয়ে। হা-মাস ইসরাইলের মধ্যেই শত্রুতা সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল, আমরিকা কিংবা ইউরোপকে শত্রু বানাতে চায় নি। একিউর কথা ছিল, এরাই ইসরাইলকে ব্যাক করছে, এদের পতন হলে ইসরাইলেরও পতন হবে। কিন্তু ইসরাইলের প্রতি এদের নগ্ন সমর্থন কিন্তু হা-মাসের সাথে এদের কোন সম্পর্ক আর গড়ে উঠে নি।

হা-মাস বা ইখওয়ানীদের একটা নীতি হলো, তারা আমরিকান জনগণকে পাশে চায়, কা-ফিরদের জনগণকে পাশে চায়। তাই তাদের ক্ষতি হোক এমন কোন কাজ তারা করে না। কিন্তু একিউ এই পদ্ধতির বিরোধী ছিল। একিউর মতে, তাদের জনগণ আসলে তেমন একটা কেয়ার করে না যে বিশ্বের এ প্রান্তে তাদের সরকারগুলো কি রকমের জুলুম করছে। নয়-এগারোর আগে আসলেও তাদের পাত্তা ছিল না। কিন্তু ইরাক-আফগান যুদ্ধের পত তাদের জনগণের একটু চোখ খোলা শুরু করে। এবার আট-অক্টবরের পর তারা আরো বেশী তাদের সরকাগুলোর মানবতাবিরোধী কাজগুলোর ব্যাপারে অবগত হয়। কিন্তু এরপরও তারা কি তাদের সরকারগুলোকে তাদের সংজ্ঞা মতই এই মানবতা বিরোধী কাজ থেকে থামাতে পারছে। তাই একিউর পলিসি হচ্ছে, কা-ফিরদের জনগণ আমাদের পক্ষে থাকলে অবশ্যই ভালো। কিন্তু তাদের জনগণকে খুশি রাখতে গিয়ে তাদের অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক কোন ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা যাবে না।

হা-মাসও অনেক চেষ্টা করেছে রাজনৈতিক ভাবে ইসরাইল-আমরিকার সাথে ডিল করতে। কিন্তু তারা পাত্তাই পায় নি। একটা পর্যায়ে তারা টু-স্টেট সলিউশনও মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের জি-হাদের পথেই আসলে ফিরে আসতে হলো। আর এই জি-হাদের কারণে কা-ফির জনগণের টনক যা নড়ার একটু নড়েছে। একিউ হয়ত হা-মাসের সব রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পক্ষে না, কিন্তু রাজনীতির মাঠে যাওয়ার বিরুদ্ধেও না একিউ। বরং একিউ রাজনীতি করতেই বলে। এখন রাজনীতি, কূটনীতির মাঠে অনেক সময় অনেক অপছন্দনীয় কাজ দেখতে পাবেন। হারামের পর্যায়েও কাজ হয়ত দেখবেন - তখন বুঝতে হবে আমাদের আদর্শ তো কুরআন-সুন্নাহ, আমরা সাহাবাদের পদক্ষেপ, ফলো করবো - এবং এখনকার মানুষদের ভুল হতে পারে, দোষ হতে পারে স্বীকার করবো, বরং কোন দোষ না থাকলেই সেটা অস্বাভাবিক। কিন্তু আইসিস এই দোষ-ভুলগুলোকে তা-কফির করার বিষয়বস্তু বানায়। যেমন ফিক্বহী ভাবে স্পেন, ফিলিপাইন বিজয় করাও কিন্তু আমাদের জন্য ফরজে আইন হয়ে আছে। সেখানে উইঘুরদের মুক্ত করা তো আরো বড় ফরজ, তাই নয় কি? এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যারা অস্বীকার করে তারা আহলুস সুন্নাহর ভিতরে আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমরা তা করছি না, আমরা কি আমরিকার পতন করতে হবে, শরীয়াহ-খিলাফাহ কায়েম করতে হবে এগুলো নিয়ে আছি। বাস্তবতা হলো এগুলো ওগুলোরই অংশ। এগুলো বিজয় করা আমাদের জন্য কাযা হয়ে আছে। তো এগুলো বিজয় করা বিভিন্ন সময় আমরিকার পতন ঘটানো, শক্তিশালী মুসলিম হুকুমত গঠন করা, খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার ধারাবাহিকতায় সেই ভূমিগুলো পুনরায় বিজয় হবে। আইসিস সহ সব ইসলামী দল এটা স্বীকার করবে। কিন্তু প্রতিপক্ষকে দমানোর জন্য তারা সিলেক্টিভলি বলবে, এরা তো এই কাজ করে না, করতে বলেও না, তাই তারা বাতিল, তাই তারা কা-ফির। এখানে সূক্ষ্ম পার্থক্যটা বুঝতে হবে। বাতিল তারা যারা শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা, মুসলিম ভূমিগুলো প্রতিরোধ এবং পুনোরুদ্ধারের বিরুদ্ধে। এখন এগুলোর পক্ষে থেকেও সাধ্যমত কিংবা প্রত্যাশা আনুযায়ী অনেকে অনেক কাজ করতে পারে না, কিংবা করে না - জাস্ট এইটুকু বাতিল বলার জন্য যথেষ্ঠ নয়, আর তা-কফির করা তো দূরের কথা।

আই-এসের লোকজনদের অভিযোগ যে, ইমারাহ শিয়াদের ভাই মনে করে, একিউ ইরানের সাথে বন্ধুত্ব করেছে, তাই তারা কা-ফির অথবা এ্যাটলিস্ট বিভ্রান্ত।

আমি এর আগের একটা পর্বতে বলেছিলাম, একিউ এবং ইমারাহর শিয়াদের ব্যাপারে স্ট্যান্স হল যে, তারা শিয়াদের সাথে ঠিক তেমন আচরণ করবে যেভাবে মদীনার মু-নাফিদদের সাথে সাহাবারা আচরণ করতেন। এবং সেই ধারণাই রাখবেন, যেই ধারণা তারা রাখবেন।

এটা সত্য যে মদীনরা মুনাফিকরা আর শিয়ারা হুবুহু এক না, কিন্তু এটা একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং ইজতিহাদ। শিয়াদের ভাই ডাকা আর তাদের জান্নাতে যাওয়া বিশ্বাস করা একই নয়। এমনকি হা-মাসের যারা কখনো কখনো শিয়াদের কুখ্যাত লীডারের নিহত হওয়ার পর, তাকে শহীদ সম্বোধন করা, একটা কূটনৈতিক কথাবার্তা - যেটা একটা অনুচিত কিংবা হারাম কাজ, কিন্তু শুধুমাত্র এটার জন্য কুফরের তকমা আরোপ করা যায় না। তেমনি ইমারা'র কেউ যদি ইরানকে ইসলামী রিপবালিক অব ইরান বলে, কিংবা কোন শিয়াকে ভাই ডাকে, জাস্ট এর জন্য কুফরের অভিযোগ আরোপ করা যায় না। সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যায়, এই কূটনীতি করে ইমারাহর কিংবা সুন্নীদের অর্জন তেমন কিছু হবে না। এজন্য ইরান সীমান্তে তালিবদের কিছু সদস্য ইরানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ লিপ্ত হওয়ার পর, সকল তালিব প্রস্তুত ছিল যুদ্ধ করার জন্য। কিন্তু লীডারশীপ মাসলাহা-মাফসাদার কারণে

ইরানের সাথে সমোঝতা করে নেয়। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, তারা শিয়াদের ভাই না শত্রুই মনে করে কিন্তু তাদের সাথে যুদ্ধ করছে না কৌশলগত কারণে।

এবার একিউর সাথে ইরানের সম্পর্কের কথা বলতে গেলে, ইরানের মধ্য দিয়ে একিউর লোকেরা ইরাক পৌছেছিল। সেক্ষেত্রে ইরানের সাথে একিউর মিত্রতা ছিল কিন্তু একটা স্বার্থের সম্পর্ক ছিল। ইরান অনেক সময় গ্রেফতার করেছে, নযরবন্দী করেছে, অনেক সময় না দেখার ভান করেছে - এটা তাদের নিজেদের স্বার্থেই। অন্তত পাকিস্তান এতটুকুও করে নি, তারা ধরে ধরে আমরিকার কাছে বিক্রি করেছে। কিন্তু এরমাধ্যমে প্রমাণিত হয় না যে ইরান আর একিউ একে অপরের মিত্র।

পূর্বেও আইএস এরকম অভিযোগ করায়, একজন একিউ শাইখ বলেছিলেন, তোমরা কাঁচের ঘরে থেকে আরেকজনের কাঁচের ঘরে ঢিল নিক্ষেপ করো না। আয-যারকাভী সহ অনেকেই আফগান থেকে ইরান হয়েই ইরাকে পৌছায়, এজন্য ইরানের দালাল হওয়া জরুরী নয়। একিউ অপারেটররা, স্পাইরা ইরানের বিভিন্ন আন্ডারগ্রাউন্ড রুট ইউস করেই আফগান টু ইরাক সফর করতো। ইরান যেন তাদের উপর চড়াও না হয়, এজন্য হয়ত ইরানের সাথে একিউ কোন সংঘর্ষে যেতে রাজি না - এটা কেউ চাইলে দাবী করতেই পারে। কিন্তু গেরিলা যুদ্ধের নিয়মের মধ্যেও পড়ে না যে, যখন আমরিকাকে প্রধানশত্রু হিসেবে টার্গেট করলাম, তখন আরেকটা শত্রুর সাথে যেচে পড়ে পার্শ্বীয় যুদ্ধ সূচনা করার কন অর্থই হয় না। এমনকি সিরিয়ার যুদ্ধও একিউ শুরু করে নি। অলরেডি শুরু হওয়া যুদ্ধকে একিউ সঠিকপথে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করেছিল মাত্র।

এখন একিউর এই কৌশলগুলোকে আইএসের লোকেরা বলে তারা স্বার্থের সাপেক্ষে যুদ্ধ করে, শরীয়াতের স্বার্থে না - তাদের সাথে অন্যান্য দুনিয়াপন্থী ইসলামী দলের আসলে কোন পার্থক্য নেই। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, আপনি সব শত্রুকে একসাথে মুকাবিলা করতে পারবেন না দেখেই, গেরিলা পদ্ধতি বেছে নিলেন। আইএস নিজে তো একসাথে সব শত্রু এমনকি যারা শত্রু না তাদেরকে শত্রু হিসেবে নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিলো, তারা কি সফল হয়েছিলো? কৌশলকে তারা দ্বীন বিমুখতার নাম দিয়েছে। এক শত্রুর সাথে চুক্তি করে, আরেক শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের চেষ্টাকে তারা নাম দিয়েছে নিফাক্ব।

যেমন পাকিস্তান আমাদের বড় শত্রু নাকি ইরান? পাকিস্তান সুন্নী হলেও এটা গণতান্ত্রিক এবং আমরিকার বলয়ে। অন্যদিকে ইরান আমরিকার বলয়ে না। আই-এসের কথা হল দুইটাকে একসাথে টেকঅন করতে হবে। একিউর কথা হল না, ইরানকে না ধরে, যেহেতু আমরিকার কারণে পাকিস্তান আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ করছে, তাই আগে পাকিস্তান পর্ব শেষ হোক। পাকিস্তান জয় হলে সুন্নীদের যেই কন্ট্রোলটা থাকবে, ইরান জয় করে কি শিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে সেই কন্ট্রোলটা থাকবে? আর জয় করাটা কি এতটা ইজি হবে? কারণ সুন্নী পাকিস্তানে রিক্রুটমেন্ট পাওয়া যাবে, সমর্থন পাওয়া যাবে, কিন্তু শিয়া ইরানে?

অর্থাৎ ইরান, শিয়ারা সুন্নীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র না ধরলে একিউও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে রাজি না। কিন্তু যেখানে যেখানে তারা আগ্রাসন চালাচ্ছে, সেখানে মুসলিমদের প্রতিরক্ষা একিউ বড় ফরজ মনে করে। কৌশলের কারণে তারা সেগুলোকে অস্বীকার করে না, যেমনটা ইমরান নযরপন্থীরা করেছিল। অনেক সুফী পন্থীরা এমন মাদখালীরাও করেছিল। একটা সময় মাদখালীরা সিরিয়ার যুদ্ধের পক্ষে থাকলেও, যখনই সৌদী নিজেদের উইথ ড্র করলো, সৌদীপন্থী মু-জাহিদ নেতা জাহারান আলুশ শহীদ হলেন রাশিয়ার হামলায়, এবং তার ভাই শিয়াদের নিকট সব অস্ত্র সমর্পন করে আত্মসমর্পণ করলো, তখন থেকে মাদখালীরা সিরিয়ার অবস্থার জন্য শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে দায়ী করলো। একই ভাবে হানাফী সুফীরা রমজান আল-বুতি শিয়া বাশার আল-আসাদকে সুন্নী ফতওয়া দিয়ে তার পক্ষে থাকায়, তারা এই বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলো।

অর্থাৎ কৌশল আর ফরজিয়াত কখনো মুখোমুখি হয়ে গেলে একিউ কৌশলের কারণে ফরজকে অস্বীকার করে না, সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টা চালায়। বরং আইএস নিজেও যখন কৌশল করে, তখন আর তাদের খবর থাকে না। যেমন মু-জাহিদ শিয়া-রাশিয়ার সাথে যখন লড়াইরত, তখন এমনও ঘটেছে, তারা শিয়া বাহিনীগুলোর এলাকা অতিক্রম করেছে, একে অপরেরকে একটা গুলিও করে নি। অতিক্রম করে সুন্নী মু-জাহিদদের এলাকায় এসে তাদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করেছে। তাদের কাছে তো উভয়ই মুরতাদ, তো একিউ যেমন ইরানকে ফেলে পাকিস্তানকে সাইজ দেয়ার চিন্তা করছে, তারাও বাশার আল-আসাদকে ফেলে সুন্নী মু-জাহিদদের সাইজ দেয়ার চিন্তা করেছিল। নিজেরা করলে দোষ নাই, অন্যরা করলেই দোষ!

এমনও ঘটনা ঘটেছে, এক মু-জাহিদ দলের গোলাবারুদ সব শেষ। একদিকে শিয়া-মিলিশিয়াগুলোর দখলে, আরেকদিকে আইএসের দখলে। তখন তারা টুইট করছিলো যে, যে কোন একপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, এবং কারো কাছেই বেঁচে থাকার কোনো আশা নেই, একদিকে নুসাইরী-রাফিযী আরেকদিকে দাঈশী-খারিজী! তারপর ইরানে একিউর বিভিন্ন নেতা বিশেষ করে সাইফ আল-আদেলকে নিয়েও দাঈশের যে অভিযোগ, তিনি ইরানের দালাল কিনা - একথার কোন ভিত্তিই নেই - এজন্য যে, যতটুকু জানি তিনি ইরানে বন্দী ছিলেন। হাউস এরেস্টে ছিলেন। এরপর কিছুদিন মুক্ত ছিলেন। এখন কোথায় আছে নিশ্চিত না। এই সময়টার মাঝে, তিনি সিরিয়াতে ইরানের স্বার্থবিরোধী কাজ করার কথাই বলেছেন একিউ এবং অন্যান্যা মুজাহিদদের। তিনি ইরানের পাপেট হলে নিশ্চয়াই ইরানের স্বার্থ বিরোধী কথা বলতেন না। তাছাড়া ড. যাওয়াহিরী বেয়াই একিউর ওয়ান অফ দা টপ লিডার আল-মাসরী এবং তার মেয়েকে হত্যা করে মোসাদ। মোসাদ হত্যা করলেও, ইরানই যে তথ্য দেয় নি এর তো কোন নিশ্চয়তা নেই। আইএসের লোকেরা নিজেদের পক্ষে গেলে আমরিকার কথাও বিশ্বাস করে। আমরিকার তখনকার মুখোপাত্র মাইখ পাম্পেও বলেছে, একিউ ইরানের দালাল, তো তার কথায় আইএসের লোকেরাও বলা শুরু করলো, যে একিউ ইরানের দালাল, কারণ ইরানের তাদের নেতাকে মোসাদ মেরেছে। এ থেকে কি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় কিছু? মোটেই না!

কারণ একিউ কি, তা একিউ বার্তা, কাজ থেকে প্রমাণিত হয়। ইরানের সাথে গোপণে যদি কোন চুক্তি হয়েও থাকে সেটা থেকে এটা বলা যায় না যে, তারা দালাল। এমনকি ইমারাহর সাথেও এমন কোন চুক্তি ইরানের হয় নি যে, তারা আইএসের বিরুদ্ধে একসাথে কাজ করবে। কিন্তু আইএসের ব্যাপারটা এত অস্পষ্ট যে, আইএসের নাম দিয়ে কারা কাজ করছে, এটার নিয়ন্ত্রণ আসলে আইএসের যে খলিফা, এবং তার স্থানীয় লীডার - তাদের কারো কাছে নেই। এখন মোসাদ কিংবা সি-আইএ কিংবা র, কিংবা পাকিস্তানের আই-এস আই (গোয়েন্দা সংস্থা) যদি কোন অপারেশন করে, সেটা দাঈশের অফিশিয়াল লোকদের কাছে ডকুমেন্টস দিয়ে বলে যে, আমরা আপনাদের সমর্থক, আপনাদের খলিফাকে বা'য়াত দিয়েছি, তারা সেই অপারেশন ক্লেইম করে নিবে। এই হল অবস্থা। তো এরকম ফলস ফ্ল্যাগ এ্যাটাকগুলো প্রতিরোধের জন্য ইরানের সাথে মিলে ইমারাহ যদি কাজও করে, তাহলে তো সেটাকে নিশ্চিতভাবে কুফর তো দূরের কথা হারামও বলা যাচ্ছে না।

জনগণের দলকে একিউ কা-ফির মনে করে না, যদি না তারা এমন কোন দস্তুর প্রকাশ করে, যেখানে সুস্পষ্ট কুফর-শিরক থাকে। এরপরও একিউ মাথাগুনে পুরো দলের সকলকে কা-ফির মনে করে না। তবে দলগতভাবে এটা কুফরের উপর পতিত দল - এবং এরা যদি কা-ফিরদের সাথে মিলে যুদ্ধ করে তাদের সাথে ঠিক সে আচরণই করা হবে, যে আচরণ কা-ফিরদের সাথে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে এই প্রকারের লোকদের মধ্যে নিশ্চয়ই কা-ফির আছে, এবং মুসলিমও আছে যারা দলের টানে কিংবা হুজুগের বসে এরকম কাজে জড়িত হয়েছে। তাই তাদেরকে তাকফীরে মুয়াইয়ান (প্রত্যেককে নির্দিষ্টভাবে কাফের সাব্যস্ত) করতে হলে আসলে আদালত লাগবে, কিংবা অন্তত নির্দিষ্টভাবে প্রত্যেকের কেইস বা কেইস দেখতে হবে যে, তাদের আসল হকিকত কি। তবে আলেমরা সাধারণত দলের নেতাদের হালত দেখবেন, তাদের ভ্রান্তি নিরসন করবেন। তারা যদি তাদের কুফর-শিরকে অটল থাকে, তাদের তাকফির করবেন। এরপরও তাদের ফলওয়ারা যদি তাদের সাথে থাকে, তো থাকলোই। তারা মু'মিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তাদেরকেও অনুরূপ ফিরিয়ে দিতে কোন বাধা নেই।

কিন্তু এরপরও কথা থেকে যায় যে, আলেমরা যাকে তাকফির করলেন, সেটাও ইজতিহাদের ভিত্তিতে। এখন আলেমদের এই ফতওয়ার সাথে একমত না হওয়ার কারণেই নিশ্চিত ভাবে এই ব্যক্তিকে কাফির বলা যাচ্ছে না - এই কারণে যে, ওই ব্যক্তি কা-ফির ইজতিহাদের ভিত্তিতে - সে কাফির আল-আসলি নয় এমনকি তার কা-ফির হবার ব্যাপারে ইজমাও প্রতিষ্ঠিত না। তাই কা-ফিরকে কাফির না বলার কারণে, সেও কা-ফির এই নীতি এখানে

ঢালাওভাবে প্রয়োগ হবে না। বরং তাদের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অন্য কুফরী সাব্যাস্ত করতে হবে, নতুবা শুধু এর ভিত্তিতে চেইন তাকফির করা যাবে না। হতে পারে ওই ফলওয়াররা সত্য সত্যই কা-ফির, কিন্তু তাই বলে উসুলের ভুল প্রয়োগ করা যাবে না। যেই বিশ্বাস কিংবা কাজের কারণে সুস্পষ্টভাবে তাদের রিদ্দা প্রমাণিত হবে, সকল অজুহাত দূর হবে - এরকম সূক্ষ্ণ কাজ বিদগ্ধ উলামারাই করতে পারেন। এবং খিলাফাহ থাকলে তারা মুরতাদদের হুদুদও কায়েম করতে পারেন।

কিন্তু যেহেতু খিলাফাহ নেই, মুসলিমদের মধ্যে অনেক লোকজন মুনা-ফিক এবং মুলহিদদের প্ররোচনায় পড়ে, কা-ফিরদের সাথে হাত মিলিয়েছে, তখন এরকম চেইন তাকফিরের অরাজকতা তৈরী হয়েছে, অপরদিকে তাকফির করা অথোরিটিও নেই, বা যারা আছে তারাও দূর্বল অবস্থায় আছে। এজন্য জনগণ জানে না যে কি কি করলে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়, এবং তারাও এরকম ঈমান বিধ্বংসী কাজে নিয়োজিত হচ্ছে।
আই-এসের মতে এই রকম দলগুলো তো কা-ফির বটে, তাদেরও যারা কা-ফির মনে করবে না তারাও কা-ফির আবার তাদেরও যারা কা-ফির মনে করবে না তারাও কা-ফির। এখানে কোন জায়গায় তারা থামে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ না থামলে, তাদের মধ্যেও এরকম লোক খুঁজলে পাওয়া যাবে, যারা এই চেইনের শেষ অংশ অথবা কোন অংশকে তা-কফির না করার কারণে তারা নিজেরাও এই কা-ফির চেইনে ঢুকে গেলো। আবরা এদের মুসলিম মনে করার কারণে, তাদের পুরো জা'মাতটাই কা-ফিরে চেইনে পড়ে কা-ফির হয়ে গেলো।
কিন্তু তাদের মধ্যে যারা একটু সামাঝদার, তারা বলে যে, তারা চেইন তাকফির করে না। তাদের খলিফা এবং উলামারা মিলে যাদের কুফরের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে, এবং অজুহাত সব তারা দূর করেছে, তারপরই যাদের তারা তাকফির করার করেছে। এর আগে নয়। আর যেহেতু তারা নিজেদের রাষ্ট্র তাও আবার মুসলিমদের একমাত্র বৈধ রাষ্ট্র খিলাফাহ মনে করে, তাদের তো অধিকার আছে যে নিজেরা নিজেরা বিচার করে, নিজেরাই সেটার রায় দিয়ে, নিজেরাই হুদুদ কায়েম করে ফেলার, রায়কে চ্যালেঞ্জ করার কোন মেকানিসম নাই। কারণ তাদের খিলাফাহ হল ক্লাউড খিলাফতের মত। বাস্তবে অস্তিত্ব না থাকলেও, প্রতিটা আই-এস সদস্যের হৃদয়ে এর অস্তিত্ব আছে। তারা নিজেদের খিলাফাহ মনে করে, বাস্তবে তামকীন, হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত আসলেই হলো কিনা এটা তাদের দেখার বিষয় নয়।

এখন যদি আমরা বলি একটা সেকুলার দল এই কাজটা করলো। এখন সেকুলররার নীতিগত ভাবে কা-ফির এব্যাপারে একিউর সন্দেহ নাই। যে আসলেই সেকুলার সে কা-ফির। এ ব্যাপারে আমিও একমত। কিন্তু মুসলিমদের মধ্যেই এরকম অনেক জা'মাত আছে, যেমন দেওবন্দ, ইখওয়ান - তারা এখানে আরেকটা স্টেজ আনতে চায় যে, সেকুলার বলতে কি বুঝানো হচ্ছে, এটার অনেক মিনিং আছে এগুলো স্পষ্ট না, তাই সেকুলার মানেই কা-ফির না। এ ব্যাপারে একিউ একমত, কিন্তু যে আসলে সেকুলারিসম প্রতিষ্ঠাতাদের সংজ্ঞার সাথে একমত না, তারা তো সেকুলারাই না। একিউ তাদের সেকুলার বলে না। অর্থাৎ ঘুরে ফিরে একই কথা। এখন একিউ যেভাবে সেকুলারদের সংজ্ঞায়ন করে তাদের কা-ফির মনে করে, অন্যরা যারা ওভাবে সংজ্ঞা না করে বিষয়টা স্থগিত রাখতে চায়, কিংবা অন্য এ্যাপ্রোচ নিতে চায়, একিউ শুধু এই জন্যেই এই অন্যাদেরও তা-কফির করে? মোটেও না। একিউ বেশী থেকে বেশী হলে, এদের অনেককে মুর্জিয়া মনে করে, কারণ এদের অনেকে বিষয়টা এ কারণে স্পষ্ট না করে স্থগিত রাখতে চায়, যেন মুলহিদদের সাথে কোন সাংঘর্ষিক সম্পর্কে তৈরী না হয়।

একিউ সাম এক্সটেন্টে এটার সাথেও একমত যে, কোন মুনাফিক বা মুলহিদদের সাথে সম্পর্কের সময় এটা বলা জরুরী না যে তুই মুনাফিক তুই মুলহিদ, বরং তার সাথে যদি দাওয়াতের সম্পর্ক হয় - তখন দাওয়াত যদি ফলপ্রসুও হয় - তাহলে তো সে পূর্বে কোন স্টেজের মুনাফিক বা মুলহিদ ছিল, সেটা আলোচনা করা অবান্তর হয়ে যায়। কিন্তু যে সব দল মূলত জি-হাদের কোন রূপরেখা রাখে না, দাওয়াত দিয়ে অবস্থার চেইঞ্জ চায়, তারা ই এ্যাপ্রোচটাই নেয় যে, মুনাফিক-মুলহিদরা দাওয়াতের মাধ্যমেই ভালো হয়ে গেলো তো আমাদের তাদের মুনাফিক-মুলহিদ বলার দরকার হচ্ছে না। কিন্তু সমস্যা হয় যদি তারা দাওয়াত গ্রহণ না করে, তখন কি হবে? তারা আর এই উত্তর দিতে পারে না। আর তাদের দাওয়াত যদি ফলপ্রসূ হওয়া শুরুর করে, তখন তাদের এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। তাই তারা একটা সময় দাওয়াতকে এই পর্যায়ে এক্সটেন্ট করে না, যে পর্যায়ে গেলে মুনাফিক-মুলহিদদের তাদের নামে ডাকতে বাধ্য হতে হয়, এবং একটা সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরী হয়।

তবে একিউ এধরণের আলেমদের দরকারী আলেম মনে করে, দালাল না। কিন্তু আই-এস এসব আলেমদের মুনাফিক কিংবা কা-ফিরই মনে করে। কারণ তারা সেকুলারদের তাকফির করছে না। আবার অনেকে সেকুলারিসমের ওয়াটার ডাউন ব্যাখ্যা হাজির করছে, কিংবা গণতন্ত্রের ইসলামী ভার্সন। উপরে সেকুলারিসম নিয়ে যা বললাম তা গণতন্ত্রের জন্যও খাটে। মৌলিকভাবে সেকুলারিসম আর গণতন্ত্র একই, যদিও মানুষ এর ভিন্নতা করে - কা-ফিরদের সাথে তাল মিলাতে, আবার আল্লাহকেও খুশি রাখতে। এরকম যারা করে তারা যে সকলেই যে ভুল করে করে, কিংবা অজ্ঞতা, শক্তি না থাকার ফলে ভয়ে করে - এমন না। অনেকে আসলেই দুনিয়া কামানোর জন্য করে। অনেকে আসলেই তেমন, যখন তারা মুসলিমদের সাথে থাকে, বলে আমরা তো তোমাদের সাথেই, আবার যখন কা-ফিরদের সাথে থাকে, বলে আমরা তো তোমাদের পাশেই, আমরা তো মু'মিনদের সাথে ছলনা করছি। এরকম মুনফিকদের ব্যাপারেও কিন্তু একিউ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করে। তাদের ক্ষতি অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেয়। আবার তার অনেক সমর্থক থাকতে পারে, তাদের আবেগ আছে তার ব্যাপারে - ভালো ধারণা আছে - একিউ এমন কাজ করতে চায় না, যেন এই সমর্থকরা একিউকে ইসলামের শত্রু মনে করে। কিন্তু আই-এসের কাছে এসব হচ্ছে স্বার্থান্বেষী কাজ। এরা মুনাফিক, এদের সাথে ছলে বলে যারা কাজ করে তারাও মুনাফিক - তারাও দ্বীন ছেড়ে দুনিয়ার জন্য কাজ করছে। এমনকি আই-এস না, এরকম অনেকেও এভাবে চিন্তা করে। অথচ নবীজী (সা) মদীনার মুনাফিকদের সাথে এমন আচরণ করছিলেন, যখন সাহাবরা এমনকি মুনাফিকের সন্তান পর্যন্ত অনুমতি চাইছিলো যে, তার বাপের কল্লাটা এনে নবীজীর (সা) চরণ তলে হাজির করতে। কিন্তু নবীজী বলেছিলেন, লোকে যেন না বলে আমি আমার সাথীদের হত্যা করি। নবীজী (সা) নিশ্চয়ই দুনিয়াদার ছিলেন না। দ্বীনের জন্য মুনাফিকদের সাথে আপোষও করেন নি। বরং এটাই মধ্যমপন্থা। তিনি আমাদের ডিপ্লোম্যেসী, পলিটিকস, পাবলিক রিলেশন সেই আমলেই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন।

ইরান শিয়া এরা সুন্নীদের বড় শত্রু নাকি আই-এস? এর উত্তরটা হচ্ছে শিয়া কিংবা ইরানের অপরাধের কাছে আই-এসের অপরাধ শিশু পর্যায়ের। কিন্তু সল্প মেয়াদের আই-এসের আঘাত এত তীব্র এবং কষ্টকর যে, সেটা সহ্য করা অনেক কঠিন। সেটার ড্যেমেজও অনেক গভীর। যেরকম ইমেইজ তারা বানিয়েছে, আর যেরকম স্ট্র্যাকচারা তারা নিজেদের জন্য তৈরী করে রেখেছে যে, যে কেউ ফলসফ্ল্যাগ এ্যাটাক করে, তাদের নামে চালিয়ে দিলেও, তারা তাদের ইমেইজ নষ্ট হচ্ছে কিনা এত কিছুর তোয়াক্কা না করে সেটা ক্লেইম করে ফেলবে এই জন্য যে তাদের অস্তিত্বটা যদি একটু জানান দেয়া যায়। তাই তাদের ক্ষতিটা শিয়াদের মত দীর্ঘ না হলেও, সল্প মেয়াদের তাদের বিরুদ্ধে ইমিডিয়েট এ্যাকশন নিতেই হয়।

আপনি কখনো দেখবেন না যে, তারা কোন হা-মলার দায় অস্বীকার করে। বরং সবগুলোই তারা ক্লেইম করে। অথচ একিউ-তালিবদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তারা অনেক সময়ই কোন হা-মলার অভিযোগ তাদোর উপর গেলে তারা তা অস্বীকার করে। এমনকি তাদের কোন সদস্য কিংবা শাখা ভুল-ভাল হা-মলা করলে তারা সেটা অস্বীকার করে, এবং দিয়ত দিতে রাজি থাকে। পূর্বে শাখাগুলোর ভুল আক্রমণকে প্রকশ্যে সমালোচনা করা না হলেও, পরে থেকে শাখাগুলো, কিংবা মিত্ররা ভুল করলে সেগুলোর গঠণমূলক সমালোচনা করা হয়। আপনারা হয়ত জানেন না, কারণ আপনারা তাদের কথাগুলো এত সহজে পান না। আর মিডিয়াও আই-এসের বিষয়গুলো ফলাও করে প্রচার করে, কারণ এত সহজে তাদের নামে জি-হাদী দলগুলোকে কালারিং করা যায়। পূর্বে এরকম অনেক ভুল কিছু তালিব-একিউর নামে ছড়ানো হয়েছে, যা তারা করে নি, মিডিয়া যেভাবে দেখাচ্ছে সেভাবে না আসলে — কিন্তু মানুষজন মিডিয়ার কথাটাই পেয়েছে, তাই কমবেশী বিশ্বাস করেছে। তাদের কথাটা পায় নি, বিশ্বাস করে নি। মিডিয়াগুলো আদর্শ আর দাড়ি-টুপি ওয়ালাদের আদর্শের ভিত্তিতে মিডিয়াকে সন্দেহ করে দাড়ি-টুপি ওয়ালাদের ব্যাপারে যে হুসনুয যন রাখবে, এই মন মানসিকতাও আমাদের নেই। কারণ মাসলাক ভিন্ন হলে, তাদের চেয়ে সেকুলার কিংবা শিয়াদের আমরা বেশী প্রধান্য দেই, তাদের নিউসগুলো বিশ্বাস করি। বিশ্বাস না হলে নিজেদের হালত একটু চেক করে দেখতে পারেন।

দীর্ঘ মেয়াদের শিয়ারা বড় শত্রু, ঐতিহাসিক শত্রু, দীর্ঘ মেয়াদের তাদের ক্ষতি অনেক। তাদের এমন মন অপরাধ আছে, যা আসলে আই-এসের নৃশংসতাকেও হার মানাবে। যেহেতু তাদের একটা হুকুমত আছে এজন্য তারা অনেকটা কূটনীতি করে চলে। আর সুন্নীদের মাঝে শিয়ারা তো তাকিয়া অর্থাৎ সুন্নীদের মত আক্বীদা পোষণ করার দাবী করে ধীরে ধীরে শিয়াইসমের বিষ সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু তাদের মিলিশিয়াগুলো যেখানেই সুন্নীদের চাইতে

শক্তিশালী হয়ে উঠে, সুন্নীদের প্রতি তাদের হিংস্রতা কতক ক্ষেত্রে ইহুদীদেরও হার মানায়। আর শিয়া কিংবা বর্তমান ইরানের সাথে ভারতের মুশরিকদের খুব ভাব। যেমনটা মদীনার ইহুদীরা মক্কার মুশরিকদের গিয়ে বলেছিলো যে, মুসলিমদের দ্বীনের চাইতে মুশরিকদের দ্বীন ভালো। এতকিছুর পরও আই-এসের ব্যাপারে যেমন ইন্ট্যান্ট ঔষধ প্রয়োগের দরকার পরে, সেখানে শিয়াদের ক্ষেত্রে একটু কূটনীতি রাজনীতির দরকার পরে। কারণ তাদের হুকুমত আছে, তাদের এজেন্টরা আছে সুন্নীদের মধ্যে। যেমন সুফীদের একপ্রকার তাদের এজেন্ট। গণতান্ত্রিকদের এক প্রকার তাদের এজেন্ট।

তো এই জন্য শিয়াদেরকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। ১. জনগণ ২. তাদের প্রশাসন ৩. মিলিশিয়া। জনগণের সাথে কখনোই যুদ্ধে জড়ানো যাবে না। হুকিমত থাকলে সাহবীদের গালাগালি করার কারণে তাদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রকাশ্যে কোন কুফরী বিষয় প্রমাণ করা গেলে হদও কায়ম করা যেতে পারে। কিন্তু সেটাকে জনগণের উপর যুদ্ধ ঘোষণা কিংবা গণহত্যার কোনো ভাইব দেয়া যাবে না। বরং প্রজন্মকে টার্গেট করে আক্বীদা চেইঞ্জের মেকানিসম তৈরী করতে হবে। সরকারগুলোর সাথে চুক্তি কিংবা যুদ্ধ বিরতি করে আপাতত ক্রুসেডর-জায়ানিস্টদের দিকে মনোযোগটা স্থির রাখা যেতে পারে। তবে তারা আগ্রাসন চালালে নিজেদের প্রতিরক্ষা নিশ্চয়ই করতে হবে। আর মিলিশিয়াদের ব্যাপারেও সেইম কথা। কিন্তু মিলিশিয়াগুলো মূলত সরকারের চাইতে অসভ্য বেশী হয়। সরকারের তো একটা জবাব দিহিতা, ব্যবস্থাপনার দায় থাকে, মিলিশিয়াদের এই দায়বদ্ধতা থাকে না। তাই তারা নির্যাতনের চরম মাত্রাটাই ব্যবহার করে সুযোগ পেলে। এদের সাথে যুধ করলেও কখনোই সেটা জনগণের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। তারা চেষ্টা করবে করার। তাই যতটুকু মিনিমাইজ করা যায়, তার চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু তাদের ক্ষতির ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। তাদের প্রতারণাগুলো নিয়ে সর্বদা কথা বলতে হবে। তারা যেন সুন্নীদের নিজেদের আক্বীদা-মানহাজে প্রভাবিত করতে না পারে, সুন্নীরা যেন তাদের তাকিয়া নিয়ে সতর্ক থাকে সে ব্যাপারে অলটাইম আপডেট থাকতে হবে। অর্থাৎ এই মু-নাফিকদের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ চলবে পুরো দমে। এর জন্য সঠিক ইতিহাস চর্চা, সাম্প্রতিক সব ঘটনাগুলোর ব্যাপারে আপডেট থাকাও জরুরী। মিডিয়ার কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস না করার জন্য কোন মিডিয়া কারা পরিচালনা করে সেগুলো জানতে হবে। বিশেষ করে কাও বিশ্বাস কর্মপদ্ধতি এবং লক্ষ্যের ব্যাপারে ভাল করে জানলে তাদের করা নিউসের সত্য মিথ্যা মোটিভ সহজে বুঝা যায়। যেমন তুর্কির প্রশাসনের লক্ষ কি, তারা মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে নিউস করলে এর সত্য মিথ্যা কিংবা মোটওইভ কি হতে পারে। মৌলবাদীরা অন্য মাসলাকের হলে আমরা কাদের পক্ষে থাকবো। কিংবা সুফী নামধারী কেউ শিয়াদের ভালোবাসে কিন্তু সালাফীদের ঘৃণা করে, তার কথার মোটিভ কি হতে পারে। সে কার স্বার্থে কথা ববে, তারা কথার, খবরের বায়াসনেস কোন দিকে থাকবে সেট বুঝা সহজ হবে। কিংবা সালাফী কেউ তারা বায়াসনেস কতটুকু থাকলে বুঝবো সে আই-এস সীম্প্যেথাইসার কিংবা মাদখালী কিংবা আসলে এরকম না, স্বাভাবিক।

***